MONOGRAPH

বাংলা লিখ্য চলিতভাষার গঠনগত বিকাশ : ইতিহাস নির্ভর অনুসন্ধান

[THE STRUCTURAL DEVELOPMENT OF COLLOQUIAL BENGALI PROSE : HISTORICAL APPROACH]

I.C.C.R LIBRARY FELLOWSHIP PROJECT 2003-04

BY

SOUGATA DAS

Organized by

INDIAN COUNCIL FOR CULTURAL RELATION

AZAD BHAVANA
INDRA PRASTHA ESTATE
NEW DELHI -- 02

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

বাংলা চলিত গদ্যের বিকাশের পর্যায়টি অনুসন্ধানের আগ্রহ জাগে একটি ভাবনা ও কৌতূহল থেকে।

মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে তার ভাবকে বহন করে তাকে সামনে থাকা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার আকাঙ্খায় ও আগ্রহে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এ সত্যের ব্যতিক্রম হয়নি।

মুখের ভাষা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে লিখ্য ভাষার মূল আদলটি। মুখের ভাষার আবেদন শেষ হয়েছে সামনে থাকা মানুষটির কাছাকাছি পৌঁছেই। কিন্তু মানব চেতনার উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক ভাষা লিখ্য ভাষার স্থান নিতে চেয়েছে বিস্তৃততর বিশ্বজনমনে ও অনাগত কালের মনে আবেদন সৃষ্টির আকাঙ্খায় আর সেই আকাঙ্খায় মুখের ভাষা থেকে লেখার ভাষায় এসেছে পারিপাট্য, মার্জনা, নমনীয়তা - সকল ভাব বহনে সক্ষমতা। যে কোন ভাষার মত বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর সত্য।

কিন্তু যখন বাংলা মৌখিক গদ্য তার লিখ্য রূপটি গ্রহণে আগ্রহী হল তখন তা মৌখিক গদ্যের মার্জিত রূপ না হয়ে হল এক নতুনতর লিখ্য গদ্য রূপ। সে ভাষা সংস্কৃতানুগ, মননঋদ্ধ, আপাত কৃত্রিম,- সে ভাষা সাধুভাষা।

কিন্তু বাংলা লিখ্য গদ্য তার বিবর্তনের দিনে এই সাধুভাষার অনুশাসন মেনে নেয়নি। বাঙালী-মানস তার স্বভাব সুলভ প্রবণতা থেকে ভাষাকে ব্যাপকতর সংবেদ্যতা বোধগম্যতা দিতে সাধুভাষার কৃত্রিম গণ্ডী থেকে সরে এসেছে। - সরল মৌখিক ভাষাকে মার্জিত রূপে লিখ্য গদ্যের অবয়বে আবাহন করেছে।

কিন্তু এই বিকাশের পথটি মসৃণ ছিল না। নানা ঘাত প্রতিঘাত উত্তীর্ণ হয়ে ভাষা তার আদর্শ রূপটি গ্রহণ করেছে। উপযুক্ত মান্যতা প্রাপ্তির পর তাকে আর পশ্চাদানুসরণ

করতে হয়নি। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষার মতনই এর পর বাংলা ভাষাও রচয়িতার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে সানন্দে আপন দেহে বহন করেছে।

আমাদের মূল আগ্রহ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে বাংলা চলিত গদ্যের বিকাশের বৈচিত্র্যময় এই ঐতিহাসিক পটটি।

বাংলা লিখ্য চলিত গদ্য ভাষার গঠনগত বিকাশের ঐতিহাসিক পটটির অনুসন্ধানের আগ্রহে আমরা বক্তব্য উপস্থাপনের যে বিন্যাসক্রম অবলম্বন করেছি তার পরিচয় নিম্নরূপ।

এ আলোচনার প্রথম অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে - বাংলা চলিত গদ্য ও তার বিকাশ - রূপটির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ। এই অধ্যায়ে বাংলা চলিত গদ্যের ক্রমবিকাশের আলোচনার প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসরণে ও আবেদনগতভাবে বাংলা সাধুগদ্য ও চলিত গদ্যের পার্থক্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। এর সাথে গদ্যের এই রূপটির বিকাশে যারা তাঁদের সক্রিয় অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মতামত ও রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম - বাংলা গদ্য-রূপকারদের আলোচনা প্রসঙ্গে চলিত গদ্যভাষার আদর্শ রূপ পরিগ্রহণের পরিচয় গ্রহণ। এই অধ্যায়ে বাংলা গদ্যের গঠনগত বিকাশে যাঁদের অবদান অবশ্য স্বীকার্য - অর্থাৎ উইলিয়ম কেরী থেকে প্রমথ চৌধুরী, পর্যন্ত সেই সব ব্যক্তিত্বের গদ্য রচনার বিস্তারিত বিবরণ, সফলতা ও প্রচেষ্টার তাৎপর্য উদাহরণ যোগে দেওয়া হয়েছে। লেখকের অসাফল্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছে যাতে সামগ্রিক রূপচিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

তৃতীয় অধ্যায় - গদ্য ভাষার চলিত রীতি পরিগ্রহণের ঐতিহাসিক রূপরেখাটির সামগ্রিক মূল্যায়ন। এখানে সমগ্র অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মূল্যমান ও ফলশ্রুতি নির্ধারণের প্রয়াস পাওয়া গেছে।

চলিত গদ্য তার বিকাশের বন্ধুর পথটি অতিক্রম করে বর্তমানে সূক্ষ্ম মনন, চিন্তন ও

সকল ভার বহনক্ষম হয়েছে। মুখের ভাষা লেখার ভাষা তথা সাধু চলিতের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সর্বগ, মান্যতাপ্রাপ্ত ও গুণগতভাবে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টিকারী হয়ে উঠেছে। হয়েছে সুচারু রূপে বিন্যস্ত। কিন্তু ভাষার ব্যবহার এখানেই থেমে থাকেনি। পরবর্তীকাল এই পরিশীলিত ও পরিণত ভাষাকে যেভাবে ব্যবহার করেছে তা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

আগেই বলেছি, পৃথিবীর ভাষার ইতিহাসে, প্রত্যেক ভাষাই তার উপযুক্ত মান্যতা প্রাপ্তির পর ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের ছাপকে বহন করে - কারণ - ভাষা কেবল ব্যক্তির রচনা নয়, ব্যক্তির নিজস্ব বাচন ভঙ্গিমা - কালগত পরিবেশ ও বিষয়ের তারতম্যে তা বিচিত্র হয়ে ওঠে। তাছাড়াও উদ্দিষ্ট পাঠক বা শ্রোতার সম্পর্কে শিল্পীর সহজ অবধান তার অলক্ষ্যেই ভাষারীতিকে প্রভাবিত করে। আমাদের অনুসন্ধান বাংলা চলিত গদ্যের আদর্শরূপ প্রাপ্তির পথের স্বরূপটি উদঘাটন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার সময়সীমা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে 'সবুজ পত্র' পত্রিকার প্রকাশকে মনে রেখে। কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যবহার আগামী আরও প্রায় একশত বৎসরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বর্তমানে উপনীত। সেই প্রায় একশত বৎসরে ভাষাকে নানা পণ্ডিত প্রতিভাবান ব্যক্তি, শিল্পী, সাহিত্যিক নানাভাবে নানা রূপে ব্যবহার করেছেন। সেই দীর্ঘ পথের ধারাবাহিক পরিচয় গ্রহণ এযাবৎ হয়নি। আমরা মনে করি, আগামীদিনের ভাষা সম্পর্কিত গবেষক এই সমৃদ্ধ অথচ অনালোচিত পথের রূপরেখাটি যদি তুলে ধরতে পারে তাহলে বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে সেও এক অন্যতর সৌন্দর্যের জগৎ উদঘাটিত করে দিতে পারবে।

বর্তমান আলোচনায় চলিত ভাষার ক্রমপরিণত হয়ে ওঠার চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করার প্রচেষ্টা হল মাত্র। আজকের সাবলীল গদ্যভাষার সম্ভাবনাময় রূপের সুদৃঢ় ভিত্তিটি কিভাবে নানা রচয়িতার পরিশ্রম ও পরিশীলনে বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছিল তাকেই ফিরে দেখার আগ্রহ ও কৌতূহল এই গবেষণাকর্মের পথটি সুনির্দিষ্ট ও ইতিহাসের নির্দিষ্ট ধারাক্রমে সীমাবদ্ধ রেখে চলতে চেয়েছে। শেষতম অধ্যায়ের সার্বিক মূল্যায়নে ভাষারচনার ইতিহাসের কেন্দ্রে নিহিত হয়ে থাকা মানুষের আকাঙ্খার স্বরূপটি লক্ষ্য করতে চাওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি ঐ বিশিষ্ট আকাঙ্খাই পরবর্তী ইতিহাসের জন্ম সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেছে।

বাংলা চলিত গদ্য ও তার বিকাশ-রূপটির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

মানুষ মনে মনে মিল চায়, মিল পায় -- তার সফলতা সহযোগিতায়।১ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যকে সামনে রেখে বলতে হয় - মনে মনে এই মিল চাওয়া ও পাওয়ার আকাঙ্খা মানুষের যখন প্রবলতর হয়েছে -- মানুষ তখনই সৃষ্টি করেছে মিল পাওয়ার পথের বাহন ভাষাকে। ভাষাই সেই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম যা আজও ক্রমান্বয়ে একজন মানুষকে আর একজন মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে নিরন্তর। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পথটি খুঁজে দেখলেও এই সত্যই উন্মোচিত হয়। বাংলা ভাষার অগ্রগতি প্রমাণ করে বাঙালী বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ-শক্তিকে বিকীর্ণ করেছে।

মুখের ভাষার আবেদন শেষ হয়ে যায় সামনে থাকা মানুষটি পর্যন্ত পৌঁছেই। কিন্তু "মানুষ জানে জানায়, মানুষ বোধ করে বোধ জাগায়। মানুষের মন কল্প জগতে সঞ্চরণ করে সৃষ্টি করে কল্পরূপ। এই কাজে ভাষা তাকে যত সহায়তা করে ততই তা উত্তরোত্তর তেজস্বী হয়ে উঠতে থাকে।"২ শুধু ওজস্বিতা নয় মানবচেতনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাষা লিখ্য ভাষার রূপটি পরিগ্রহণ করতে চায় বিশ্বজনমনে ও অনাগত কালের মানব মনে স্বীয় আবেদন সৃষ্টির আকাঙ্খায়। মুখের ভাষা তাৎক্ষণিক মূল্যে নিঃশেষ হয়ে যায় কিন্তু বিস্তৃত পরিধিতে, বৃহত্তর মানবমনে পৌঁছোতে লেখার ভাষার চাই স্থায়িত্ব, সেই মূল্যমান গ্রহণের আকাঙ্খায় সে ভাষায় নিয়োজিত হয় পারিপাট্য, নমনীয়তা, সকল ভার বহনে সক্ষমতা। এই সক্ষম ভাষারূপটি কালক্রমে নানা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তাকে ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বলতে চেয়েছি।

বাংলা লিখ্য গদ্য গড়ে ওঠার ইতিহাসটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় - বাংলা মৌখিক ভাষা যখন লিখ্য গদ্য ভাষার রূপটি পরিগ্রহ করতে চেয়েছে তখন তা মুখের ভাষার মার্জিত নমনীয় লিখ্য রূপ না হয়ে এক কৃত্রিম লিখ্যভাষার রূপ নিয়েছে যাকে আমরা বাংলা গদ্যের সাধু রূপ বলেছি। 'সাধু' অর্থে যা মার্জিত, পরিপাটি, সুন্দর। আবার দেখা গেল, সাহিত্য সৃষ্টি

তথা মননঋদ্ধ ও সৃজনশীল রচনার বাহন সাধুভাষা হলেও নিতান্ত কেজো উদ্দেশ্যে, ব্যবহৃত মুখে মুখে চলমান এক গদ্যভাষা তো ছিলই। মুখে মুখে চলমান এই গদ্যের স্বভাবকে অবলম্বন করে গদ্যভাষার আরও এক রূপ, যাকে চলিত গদ্য বলি তা-ও সৃষ্টি হয়েছে। দিন পরিবর্তনের ধারায় দেখি ধীরে ধীরে সেই চলিত গদ্যই স্থান নিয়েছে সাধুভাষার। অনবদ্য সজজায় সজ্জিত করেছে নিজেকে। কৃত্রিম সাধুভাষা বাধ্য হয়েই তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন দিয়েছে এ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কাকে চলিত ভাষা এবং কাকেই বা সাধুভাষা বলা হয় - কিই বা তাদের মধ্যে পার্থক্য সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

চলিত শব্দের উৎপত্তি 'চলতি' শব্দ থেকে। যে ভাষা চলমান তাকে আমরা চলিত ভাষা বলি। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে - "ভাগীরথী নদীর উভয় তীরস্থ ভদ্র মৌখিক ভাষা ও তার আধারের উপর স্থাপিত যে নতুন সাহিত্যিক ভাষা"৩ তাকেই চলিত বাংলা ভাষা বলা হয়। ড. চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মতামতকে পরবর্তী কালের ভাষাতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন নিঃসংশয়ে।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এখানে লিখ্য চলিত গদ্যভাষার কথাই বলতে চেয়েছেন কিন্তু তারই ভিত্তি ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের ভদ্রজনের মৌখিক ভাষা।

অপরপক্ষে সাধু শব্দটির অর্থ - শিষ্ট বা মার্জিত। অভিধানের নির্দেশ মত 'মার্জিত ও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বাংলা লিখ্য ভাষাকে আমরা সাধুভাষা বলে থাকি'৪ লিখ্য সাধুভাষার যথার্থ স্রষ্টা ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর পূর্বেই এই শিষ্ট রীতিটির নামকরণ 'সাধুভাষা' পাওয়া যায় রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থের প্রবেশিকা অংশে।৫ এর পরবর্তী আলোচনায় দেখব, - সাধুভাষারও উৎস কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতজনের মুখের ভাষা। তাহলে বোঝা গেল - গদ্যের সাধু ও চলিত এই দুটি রূপেরই উৎসগত দিক থেকে সামঞ্জস্য আছে।

ড. রামেশ্বর শ' বলেছেন "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যের ভাষা [লিখ্য ভাষা] মুখের ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকে। . . . . এই দ্বিধা বিভক্তি বাংলাতেও আছে; কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, এই দ্বিধা বিভক্তি ছাড়াও বাংলা ভাষায় এক সময় আরো এক

রকমের দ্বিধা বিভক্তি দেখা যায় - সে দুটি হল সাধুভাষা ও চলিত ভাষা।"৬ ড. রামেশ্বর শ'য়ের প্রথম কথা থেকে বোঝা গেল - সাধারণভাবে লিখতে গেলেই মুখের ভাষা ও লেখার ভাষায় পার্থক্য ঘটে যায়। অন্যপক্ষে, বাংলা ভাষায় অন্যতর পার্থক্য জন্ম নিয়েছে সাধু ও চলিত রীতিগত। আমরা দেখব - এই পার্থক্যের কারণ নিহিত আছে দুটি ভাষার স্বভাবের মধ্যে।

সাধুভাষার স্বভাব পরিচয় নির্দিষ্ট করতে গিয়ে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - " . . . . with its norms belonging to middle Bengali, and its vocabulary highly Sanskritized"৭ বিশেষজ্ঞের উক্তিতে বোঝা গেল মধ্যযুগের বাংলা ভাষার শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ সম্বলিত সাধুভাষার শব্দভান্ডার সংস্কৃত ভাষার শব্দভান্ডারের অনুগামী। স্বভাবে সে ভাষা গম্ভীর, মননসমৃদ্ধ - তাই এক কৃত্রিমতার ভার তাকে বহন করতেই হয়। - সাধুভাষা ঘষামাজা করা সংস্কৃত অভিধান থেকে ধার করা শব্দ-অলঙ্কৃত কিন্তু তার দেহে লাবণ্যের কমনীয়তা কম, আছে পাথর কোঁদা কঠিন গড়ন যা ভাস্কর্যের মত। এই দুটি রীতির পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত করতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - "সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান তফাৎটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাৎ নিয়ে।"৮

কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহারের পার্থক্য থাকলেও - আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে কেবলমাত্র সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপের পরিবর্তন সাধনেই সাধুভাষা চলিত ভাষায় রূপান্তরিত হয় না।

ব্যাকরণ নির্দেশিত পার্থক্যের কথা স্বীকার করেও একটি সহজ সত্য আমাদের চোখে পড়ে - সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার মূল পার্থক্য নির্ভর করে তার আবেদনগত পার্থক্যের উপর। চলিত ভাষা তার আবেদনগত প্রত্যক্ষতা নিয়ে আমাদের মনে সংবেদন সৃষ্টি করে দ্রুত ; অন্যপক্ষে, সাধুভাষা মার্জিত পরিপাটি, বুদ্ধিগ্রাহ্য। একথা বলি না যে চলিতভাষা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় কিন্তু সাধুভাষার আবেদন আমাদের চিন্তনের একটি স্তর অতিক্রম করে আমাদের চেতনায় ধরা দেয়। চলিতভাষার আবেদন সরাসরি।

ড. শিশির কুমার দাশ তাঁর 'ভাষা জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে - "ভাষায় শব্দ

ভান্ডারের বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন, মানুষের অভিজ্ঞতা।"৯ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে প্রত্যেক মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার প্রতিটি পদক্ষেপে তার নিজস্ব সংস্কৃতির ছাপ রেখে যায়। অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয় সংস্কৃতির চর্চার সঙ্গেই। এইভাবে মানুষ তার প্রতিদিনের জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। জীবনের সঙ্গে মানুষ যদি তার সংস্কৃতির মিল না পায় তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য - এক সহজ সম্পর্ক দুইএর মধ্যে বর্তমান। মানুষ তার জীবন প্রবাহে নিজের সংস্কৃতিকে গ্রহণ ও সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম রূপে প্রথমেই ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে ভাষা যদি একান্তই প্রত্যক্ষ আবেদনকারী না হয় ; তবে মানুষের সঙ্গে তার জীবনসংস্কৃতির সংযোগ ঘটাতে তার ব্যর্থতারই পরিচয় পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "যে ভাষায় অনেক বেশী শব্দ বা ভাবোপযোগী শব্দ আছে সেই ভাষা স্বভাবতই তত উন্নত।"১০ বাংলা সাধুভাষা তৎসম শব্দে সমৃদ্ধ হলেও নানা ভাষা থেকে আগত কৃতঋণ শব্দ সহজে স্থান করে নিতে পারেনি সে ভাষার শব্দভান্ডারে। আগেই বলেছি সাধুভাষা সংস্কৃত শব্দভান্ডার নির্ভর। তাই মার্জিত করে সে মনোভাব প্রকাশে পারদর্শী কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশে বিষয়ভেদে হয়তো বা আড়ষ্টও। ধরা যাক 'হয়রান' ও 'দরদ' শব্দ দুটিকে - দুটিই বাংলা শব্দ ভান্ডারে আগত বিদেশী শব্দ। কিন্তু হয়রান শব্দটির মধ্যে যে বিরক্তি মেশানো শ্রান্তির অর্থ প্রকাশ পায় কোন একক সংস্কৃত শব্দে তা প্রকাশ করা অসম্ভব প্রায়। অন্য পক্ষে 'দরদ' শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত 'সংবেদনা' শব্দটি বসালে দরদ শব্দের আবেদন পূর্ণ রূপে প্রকাশ পায়না।

হয়রান বা দরদ শব্দ দুটি সাধারণভাবে সাধুভাষায় ব্যবহারের অনুমতি পায়নি কিন্তু চলিত বাংলায় তাদের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। আর এই জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি চলিত বাংলায় আছে বলেই চলিত ভাষার ব্যাপ্তি ও গভীরতা হয়তো বা অন্তরঙ্গতাও ব্যাপকতর ; অথচ আবেদন অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। আর "এটা হতে পেরেছে তার কারণ সীমা সরহদ্দ নিয়ে মামলা করে না চলিত ভাষা।"১১

এতো গেল চলিত ভাষার স্বভাবগত প্রত্যক্ষতার কথা। আগে বলা হয়েছে যে মানুষ

ভাষা সৃষ্টি করেছে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার উদ্দেশ্য নিয়ে - মিলনের চূড়ান্ত পরিণতির আনন্দ গ্রহণে সে সদাই আগ্রহী। কিন্তু সে আনন্দ গ্রহণে ভাষা যদি তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তবে সৃষ্টিই ব্যর্থ - সংস্কৃতজাত সাধুভাষার ক্ষেত্রে এইটাই চূড়ান্ত সত্য - যে, সে সকল ক্ষেত্রে সকলের মনে সমান আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ নয়। কিন্তু চলিত ভাষার এই অবকাশ অনেক বেশী। বিবেকানন্দের কথায় এই বক্তব্য স্পষ্টতা পেতে পারে - তিনি বলেছিলেন যেটা [ভাষা] ভাবহীন প্রাণহীন - সে ভাষা শিল্প সঙ্গীত কোনও কাজের নয় . . . . দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে তা দুহাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।১২

তিনি আরও বলেছেন - "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি যে ভাষায় ক্ষোভ দুঃখ ভালবাসা জানাই তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।"১৩

এই মতামত থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়েই যায় যে ব্যাকরণগতভাবে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য যাই হোক না কেন - কৃত্রিম সাধুভাষার থেকে চলিত ভাষার আবেদনে যে তীব্র প্রত্যক্ষতা আছে, যে কোনও সচেতন চিন্তাবিদ প্রথমে তাকেই সাদরে আহ্বান করে নেবেন।

আমাদের স্বীকার করে নিতে তাই আর বাধা থাকে না যে চলিত ভাষা তার প্রত্যক্ষ আবেদন রচনার গুণপনায় বাঙালী হৃদয়কে জয় করে নিয়েছে।

ফলকথা : বাংলা মৌখিক গদ্যভাষা তার লিখ্য রূপ পরিগ্রহণের কালে তা মৌখিক ভাষার মার্জিত লিখ্য রূপ না হয়ে সংস্কৃতানুগ কৃত্রিম সাধুগদ্যের রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। অন্যপক্ষে চলিত ভাষা ছিল প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারের গদ্যভাষা। স্বভাবগত দিক থেকেই তার বিস্তৃত শব্দভান্ডার, বাক্যনির্মাণের সংক্ষিপ্ততা, সংহতি আমাদের কাছে তার প্রত্যক্ষতাকে তীব্রতর করেছিল।

বাঙালী মানস কৃত্রিম সংস্কৃতানুগ সাধুভাষার ভার দীর্ঘকাল ব্যবহার করতে চায় নি। লেখায় তার পরিবর্তে সে গ্রহণ করেছে সহজতর - বিস্তৃত আবেদন সৃষ্টিতে পারঙ্গম নিত্য পরিচিত চলিত ভাষাকে।

কিন্তু চলিত ভাষাকে তার যথার্থ লিখ্য গদ্যের রূপ গ্রহণ করতে সময় লেগেছিল অনেক - বাংলা গদ্য চর্চার সূচনা থেকে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা কাল থেকে লিখ্য চলিতকে তার মান্যতা প্রাপ্তির প্রয়াসে এগিয়ে যেতে হয়েছিল আরও প্রায় একশত বৎসর। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'সবুজপত্র'(১৯১৪খৃঃ) পত্রিকার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা চলিত গদ্য তার সর্বগ আদর্শ রূপ প্রাপ্তির স্বীকৃতি লাভ করে।

কিন্তু এই মান্যতা প্রাপ্তির পথের যাত্রা নিতান্ত মসৃণ ছিল না - নানা-সৃষ্টির দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব থেকে জাত আবারও নতুন সৃষ্টি - এইভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পথ উত্তীর্ণ হয়ে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে পেরেছিল। এর পর ভাষাকে আর নতুন করে মান্যতা প্রাপ্তির কথা ভাবতে হয়নি - পৃথিবীর আর প্রায় সকল ভাষার মতনই এর পরবর্তী কালে সে নির্দ্বিধায় বহন করতে পেরেছে লেখক ব্যক্তিত্বের চিহ্নকে। ইতিহাসের সেই দীর্ঘ পথের রূপরেখাটির প্রাথমিকভাবে পরিচয় নিতে এবার আলোচনা অগ্রসর হবে।

উনবিংশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদিতে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা গদ্যের নিয়মিত চর্চার সূচনা হয়।

এর আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্যভাষার সীমিত ব্যবহারের দুটি কারণ অনুধাবন করা যেতে পারে - প্রথমত গদ্যভাষা যুক্তি নির্ভরতাকে বহন করতে সক্ষম। বাঙালী তার যুক্তিনিষ্ঠ মনকে নতুন করে যেন প্রাধান্য দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা কাল থেকে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন বাংলা গদ্যকে তার বিকাশের পথে বিস্তৃত সহায়তা দান করেছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে। এর পূর্ববর্তী কালে বাঙালী তার সৃষ্টিকে পদ্যের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে - কেননা গদ্যের তুলনায় পদ্য মনে রাখা অনেক বেশী সহজ। মুদ্রন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মৌখিকভাবে সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর প্রয়োজন রইল না।

অন্যপক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ ইতিহাসের পট পরিবর্তন গদ্যভাষাকে আরও যুক্তি নির্ভর হয়ে উঠতে সক্ষম করে তুলেছিল - তা আগেও বলেছি।

যদিও আমাদের একথা স্বীকার করে নিতেই হয় যে বাংলা গদ্যচর্চা সচেতনভাবে বাঙালী শুরু করেনি। সিভিলিয়ন সাহেবদের বাংলা ভাষার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরাজ শাসকগণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। এইখান থেকেই বাংলা গদ্য ভাষা চর্চার ইতিহাসের সূচনা কাল ধরা যেতে পারে।

বাংলার শিক্ষকরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দিলেন উইলিয়ম কেরী সাহেব ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। বাংলা গদ্যচর্চার সূচনা মূলতঃ তাঁর হাত ধরেই। কেরী তার নানা ভাষায় পান্ডিত্য ও ব্যবহারিক বোধ থেকে বুঝেছিলেন যে, বাংলা ভাষার সঙ্গে বিদেশী ছাত্রদের পরিচয় ঘটাতে হলে বাংলা মৌখিক ভাষাকেই প্রাথমিকভাবে আশ্রয় করা প্রয়োজন। কিন্তু আগেই বলেছি সে ছিল বাংলা গদ্যভাষা চর্চার প্রাথমিক যুগ। বাংলা ভাষার কোনও আদর্শ সেদিন কেরীর কাছে ছিল না। উইলিয়ম কেরী তাঁর অধ্যবসায় দ্বারা গদ্য চর্চার সূচনাটি করেছিলেন ঠিকই কিন্তু বাংলা গদ্যভাষাকে একটি সমর্থ রূপ দিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি -- তবু তাঁর সচেতন প্রয়াসের ছাপ আমরা পাই তার সম্পাদিত 'কথোপকথন' (১৮০১) গ্রন্থে ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২ খ্রীঃ) গ্রন্থে।

উইলিয়ম কেরীর একজন সহযোগী রূপে তৎকালেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৮০১ খ্রীঃ) - ইনি কেরী প্রদর্শিত পথেই চালিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিভা বাংলা গদ্যের বিকাশকে আরও এক ধাপ উন্নীত করেছিল -- মৃত্যুঞ্জয়কৃত বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ এবং 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (১৮০২) গ্রন্থে তাঁর ভাষা ব্যবহারে তার সাক্ষর মেলে।

এর পরে বাংলা ভাষার গঠনগত দিকটিকে প্রথম সার্থকভাবে নির্দেশ করেন রামমোহন রায়। যদিও বাংলা গদ্য চর্চার বা সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না কিন্তু শাস্ত্র ইত্যাদির বাংলা ভাষায় অনুবাদের সূত্রেই তিনি বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দান করেছিলেন।

বাংলা গদ্যকে তার যথার্থ শৈল্পিক মর্যাদায় প্রথম ভূষিত করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য খ্যাতি যেমন বাংলাদেশকে মোহিত করেছিল, তেমনি তাঁর সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, বিশেষতঃ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধ - ইত্যাদি নানা সামাজিক আন্দোলনে তাঁর অবদান ; তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রতি বাঙালীকে শ্রদ্ধাশীল করেছিল। বিশেষতঃ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বাংলা ভাষাকে গড়ে তোলেন। বাংলার পাঠ্য পুস্তক রচনা তার সামগ্রিক কর্ম জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা ভাষায় কোন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেননি। কিছু সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন।

আমাদের আলোচনায় বিদ্যাসাগরের গুরুত্ব এখানেই যে তাঁর হাতে প্রথম বাংলা লিখ্য সাধুগদ্যের রূপটি নির্মিত হয় যথাযথ সুন্দরভাবে -- এবং যে ভাষা সর্বগ, সাবলীল। কিভাবে তা সংঘটিত হল তার ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। কিন্তু একথাও বর্তমান প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে সংস্কৃতজ্ঞ এই পণ্ডিত মানুষটি লিখ্য সাধুগদ্যের রূপটি উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিত বর্গের মুখের ভাষাকেই ভিত্তিরূপে আশ্রয় করে গড়ে তুলেছিলেন। আবার ছদ্মনামে রচিত তাঁর 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩ খৃঃ) 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩ খৃঃ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি বাংলা চলিত গদ্যের বিকাশের ধারায় উল্লেখযোগ্য তা পেয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী চিন্তাবিদ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম লেখক যিনি সচেতনভাবে বাংলা লিখ্য গদ্যভাষাকে মৌখিক গদ্য ভাষার নিকটবর্তী করে নির্মাণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রচলিত সাধুভাষার সীমাবদ্ধতা ও সাধুভাষার সীমায়িত পাঠক-বর্গের দিকে তাকিয়ে তিনিই সেদিন মৌখিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে ও সেই সর্বজনবোধ্য ভাষার রচনাকে সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছিলেন 'মাসিক পত্রিকা' (প্রথম প্রকাশ - ১৬ই আগষ্ট ১৮৫৪ খৃঃ) এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) রচনাটি। এর পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে - বিচ্ছিন্নভাবে মৌখিক ভাষার কিছু শব্দ ব্যবহার ছাড়া সামগ্রিকভাবে বিদ্যাসাগরের গদ্যের কোন বিকল্প রূপ তিনি গড়ে দিতে পারেন নি। এমন কি ঐ গ্রন্থের

শেষের অংশে তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষাকেই গ্রহণ করে ফেলেছিলেন।

বাংলা চলিত গদ্যকে লিখ্য ভাষার মর্যাদা দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন কবি মধুসূদন দত্ত। এ বিষয়ে প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিতর্কও হয়। কিন্তু কিংবদন্তী স্বরূপ এই কবি তাঁর প্রহসনে বাংলা চলিত গদ্যের ব্যবহার করেছেন স্বচ্ছন্দে - 'একেই কি বলে সভ্যতায়' (১৮৬০খৃঃ)ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের সংলাপ তার সাক্ষর বহন করে।

বাংলা চলিত মৌখিক গদ্য ভাষাকে প্রথম তার যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামে তিনি লেখেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (প্রকাশকাল - ১৮৬১-৬২) গ্রন্থটি - কলকাতার এক বিশেষ অঞ্চলের মুখের ভাষাকে আশ্রয় করে লেখা ব্যঙ্গাত্মক নকশা জাতীয় রচনা এটি। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের চলিত বাংলা গদ্যের বিকাশে এটিই শ্রেষ্ঠ প্রয়াস। সাধারণ চলিত ভাষা আশ্রয় করে সাহিত্য রচনার পথটি তিনিই প্রথম উন্মোচিত করেন। কেবল তাই নয় - ঐ মৌখিক গদ্যের কাঠামোটির প্রায় অবিকৃত ; এমন কি অমার্জিত শব্দসহ প্রয়োগ তিনি করেছেন তাঁর রচনায়। কিন্তু পরবর্তী কালে লেখকরা এই ভাষাকেও সকল রকম ভাবপ্রকাশের উপযোগীরূপে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ এই ভাষা কেবলমাত্র একটি বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ভাষা রূপে উপযুক্ত ছিল। তবু স্বীকার করতেই হয় যে কালী প্রসন্ন সিংহ চলিত গদ্যের ব্যবহারের যে পথ নির্দেশ করে গেলেন পরবর্তী স্রষ্টাদের কাছে তার মূল্য কিছু কম নয়। পরবর্তী অংশে এই ভাষার আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে।

এইভাবে চলিত লিখ্য গদ্যের গড়ে ওঠার ইতিহাস পরিক্রমা করলে বোঝা যায় - নানা ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের কথ্যভাষার রূপকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ জুড়ে - কিন্তু তবু সব রকমের ভাব প্রকাশের জন্য ভারসহ ভাষার ভিত্তি কি হবে তার সমাধান তখনও মেলেনি - সেই প্রাপ্তির জন্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই সেই শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বাংলা চলিত ভাষা যার হাতে তার সর্বগ রূপটি পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের হাতে আমরা চলিত গদ্যের আদর্শ রূপটি পেয়ে গেলেও আরও

দুজনের নাম উচ্চারিত না হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

প্রথমজন অবনীন্দ্রনাথ - অবনীন্দ্রনাথ প্রধানত ছিলেন চিত্রশিল্পী - কিন্তু তাঁর সেই প্রতিভার প্রয়োগ তিনি ভাষা শিল্প রচনার ক্ষেত্রেও করেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে এক বিস্ময়কর চিত্রগীতময় চলিত বাংলা গদ্য পেয়েছি যা হয়ত তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল - পরবর্তী কাল কিন্তু সে ভাষার সম্ভাবনাকে বহন করতে পারে নি - পারা হয়ত সম্ভবও ছিল না।

পরিশেষে প্রমথ চৌধুরীর অবদান প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করে আমরা আমাদের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করব।

বাংলা চলিত গদ্যকে যিনি সাহিত্যে সৃষ্টির একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্র সমসাময়িক লেখক ছিলেন তিনি। বাংলা চলিত গদ্যকে তার যোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করতে প্রমথ চৌধুরীর সহায়ক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তবু আমাদের একথা স্বীকার করতেই হয় যে তীক্ষ্ণধী, মনীষা ও চিন্তাশীলতার দ্বারা প্রমথ চৌধুরী বুঝেছিলেন চলিত গদ্য ভাষাকেই লেখার সময় প্রধানভাবে অবলম্বন করা উচিত। এই ভাবনা থেকেই তিনি 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় (১৯১৪ খৃঃ) চলিত গদ্য ভাষাকে অবলম্বন করেন। আর সেই পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষার সৃষ্টিকে প্রকাশ করেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যদিও বাংলা চলিত গদ্যকে লিখ্য গদ্যের মর্যাদা দানে প্রমথ চৌধুরীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর লিখিত গদ্যের আবেদন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও মনন সমৃদ্ধ হওয়ায় আমরা তাকে কতটা চলিত গদ্য বলব তা নিয়ে বিচারের অবকাশ তৈরি হয়ে যায়। এইসব ভাবনারই বিস্তৃত পর্যালোচনা পরের অধ্যায়ে যুক্ত হবে।

এবার যে কথা উল্লেখ করতে হয়, আমাদের আলোচিত এই প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখতে চেয়েছি - লিখ্য চলিতগদ্য ভাষা সৃষ্টির ঐতিহাসিক রূপরেখাটি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, প্রমথ চৌধুরী সচেতনভাবে চলিত গদ্যভাষার লিখ্যরূপ প্রচলনে যে উদ্যম নিয়েছিলেন তাতেই এই ভাষারূপটি ব্যবহারের পথ অবারিত হয়ে গেল। এর ব্যবহার আরও বিস্তৃত

হল। সবচেয়ে বড় কথা - 'সবুজ পত্রে'র উদ্যমেই উৎসাহী রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্যভাষাকে দৃঢ় প্রত্যয়ে অবলম্বন করে পরবর্তীকালের আদর্শ চলিত লিখ্যভাষার বনিয়াদ গড়ে দিলেন। ইতিহাসের এই পরিচ্ছন্ন পদপাতটির পরম্পরা প্রেক্ষাপটে রেখে দ্বিতীয় অধ্যায়ে একেই বিশদভাবে পরিস্ফুট করতে এবার আমরা অগ্রসর হবো।

প্রথম পর্যায় গ্রন্থ নির্দেশ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - মানুষের ধর্ম - বিশ্ব ভারতী পৃঃ- ৯

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - বাংলা ভাষা পরিচয় - রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩ - বিশ্ব ভারতী- পৃঃ - ৫৭৮

৩। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় - বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে - পৃঃ - ৩০২

৪। সংসদ বাঙ্গলা অভিধান -পৃঃ - ৬৮১

৫। রামমোহন রায় - বেদান্ত গ্রন্থ - ১৮১৫ সূচনা অংশ

৬।রামেশ্বর শ' - সাধুভাষা ও চলিতভাষা - সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - পৃঃ - ৬৬২

৭।Prof. Suniti Kumar Chatterjee -The Origin and the Development of the Bengali Language - London - 1970 Page -134

৮।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - বাংলা ভাষা পরিচয় - রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩ - বিশ্ব ভারতী- পৃঃ-৫৮৪

৯। শিশির কুমার দাশ - ভাষা ও বহির্জগৎ - ভাষা জিজ্ঞাসা - পৃঃ - ২৫

১০। তদেব - পৃঃ - ৩৮

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - বাংলা ভাষা পরিচয় -রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩ - বিশ্ব ভারতী পৃঃ-৫৮৫

১২। স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গালা ভাষা - স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা-৬ পৃঃ-৩০

১৩। তদেব - পৃ - ২৯

বাংলা গদ্য-রূপকারদের আলোচনা প্রসঙ্গে চলিত গদ্যভাষার আদর্শরূপ পরিগ্রহণের পরিচয় গ্রহণ।

বাংলা গদ্যের রূপকার-সম্পর্কিত আলোচনা উইলিয়ম কেরীর অবদান থেকে শুরু হওয়া উচিত বলে মনে করি। মনে রাখতে হবে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই বাংলা গদ্য ভাষা নিছক মৌখিক ব্যবহারগত প্রয়োজনের গন্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল - যদিও সরাসরি সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার ছিলনা, তখন তা সম্ভবও ছিল না। এবার গদ্যভাষা তার যথাযথ রূপে লেখার ভাষায় বিন্যস্ত হতে চাইল কারণ এবার বাঙালী নয় এবার পৌঁছোতে হবে বিদেশী ছাত্রদের কাছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক রূপে যোগদান করেন উইলিয়াম কেরী। বাংলা গদ্য ভাষার চর্চা মূলত তাঁর উদ্যোগেই। এই ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন কিছু বিদেশী ছাত্রকে বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার ভার ছিল কেরী সাহেবের উপরে - কিন্তু বাংলা ভাষা গঠনের নির্দিষ্ট কোনও পথ সেদিন তাঁর সামনে ছিল না। কেরী ছিলেন বহুভাষাবিদ - হিব্রু, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল-১ বাংলা ভাষায় বিদেশী শিক্ষানবীশদের শিক্ষিত করে তোলার তাগিদে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন অন্যপক্ষে বহুভাষাভিজ্ঞ হওয়ার সুবাদে তাঁর সূক্ষ্ম ব্যাবহারিক বোধ থেকে তিনি বুঝেছিলেন - সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হলেও, বাংলা ভাষাকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে গেলে মূলতঃ মুখের ভাষাকেই আশ্রয় করতে হয়। আর এই কারণে কেরীকেই বাংলা গদ্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ নিয়ামকের পথিকৃৎ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়ভার কেরী দিয়েছিলেন অন্যান্য শিক্ষকদের। নিজে তিনি মুখের ভাষার নির্দশন সংগ্রহ করে সম্পাদনা করলেন 'কথোপকথন' (১৮০১) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের 'মাইয়া কন্দল' অংশে পাওয়া যায় -

মাইয়া কন্দল

"তুমি কোথা গিয়াছিলা পাড়া বেড়ানী সাঁজের কায কাম কিছু মনে নাই বটে।
কি কাযের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো।
আমি কাযে ঠেকি নাই তুই সকল কাযে ঠেকিয়াছিস।
তুই আমার কি কাযে ঠেকিয়া এত কথা কইস লো।
চক্ষুখাকি তোর চক্ষের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না এ সকল কায কে করিয়াছে।"২

উক্ত অংশটি আমাদের আলোচনায় গ্রহনীয় হয়েছে, কারণ উদ্ধৃত অংশটির তীক্ষ্ণ ভাব কথ্য ভাষার জোরালো আবেদনটিকে যেন স্পষ্ট করে তোলে। উদ্ধৃত অংশে 'বটে' 'লো' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে এভাষা একান্তই কথ্য ভাষার লিখিত রূপ। তাছাড়াও - 'চক্ষুখাকি' ইত্যাদি অমার্জিত শব্দের ব্যবহার সাধারণত বাঙালী অনুন্নত সম্প্রদায়ের মেয়েরা পরস্পর বিবাদকালেই ব্যবহার করে থাকে। সর্বোপরি বাক্য বিন্যাসে মুখের ভাষার আদলটি সহজেই চোখে পড়ে। দ্বিতীয় বাক্যে, ক্রিয়াপদটিকে বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করায় - কৈফিয়ৎ আদায়ের তীব্রতা ও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার আকাঙ্খা বাক্যে প্রবলতর হয়েছে - সচেতন কেরী বলেছিলেন - " Woman speak a language considerably differing from that of the man, especially in their quarrels."৩ কেরীর উদ্দেশ্যও ছিল এই ব্যাবহারিক ভাষা সম্পর্কে ছাত্রকে সচেতন করা। বর্তমান গবেষণা, চলিত গদ্যভাষা গড়ে ওঠার ইতিহাস উন্মোচিত করতে পরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গে আমরা যে কারণে কেরীর গ্রন্থের নিদর্শন গ্রহণ করেছি তার কারণ - 'কথোপকথন' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রসঙ্গে কেরী বলেছিলেন - "When the student compares his literal translation , he could easily see the reason of those apparent irregularities and gain a flexiblity of expression, which he could not be soon acquired by constant and rigid attention of grammatical rules alone".৪

গ্রন্থটি সম্পাদনা সূত্রে তিনি বলেন - "I do not suggest by this, that those conversations are ungrammatical ; even those dialouges are strictly regular which are inserted on purpose to show the difference of idom among the lower order of people in

different situations."৫ উক্ত বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে কেরী যদিও নিম্নশ্রেণীর মানুষের ব্যাবহারিক ভাষার পার্থক্য ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন তা হলেও আরও তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি তিনি দেখিয়ে দিলেন তা হল - শুধু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী বা ব্যাকরণ শিক্ষা হলেই ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে পরিচিতি হলে তবেই ভাষার ব্যবহারে নমনীয়তা ও ক্ষিপ্রতা আসা সম্ভব হয়। এবং rigid attention of grammatical rule - একজন শিক্ষানবীশের কাছে বাংলা ভাষাকে যত না প্রত্যক্ষ করে তোলে তার চেয়ে a flexibility of expression ভাষাকে তার কাছে অনেক বেশী দ্রুত পৌঁছে দেয়। পরবর্তীকালে মৌখিক ভাষাকে সরাসরি লিখ্য ভাষা রূপে গ্রহণ করার আগ্রহের পেছনে রয়েছে মৌখিক ভাষার এই প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টির ক্ষমতটি। কেরীর নাম বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাসে নিঃসংশয়ে উচ্চারিত হওয়ার একমাত্র কারণ এখানেই যে, কেরীই প্রথম আমাদের সচেতন করে দেন, যে - কোনও ভাষার আবেদন গত প্রত্যক্ষতাই সেই ভাষাকে গ্রহনীয় করে তোলে ; ভাষার ব্যাকরণগত দিকটি সেখানে তুলনায় গুরুত্বহীন হয়েই যায়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, কেরীকে আমরা বাংলা গদ্যের রূপ নিয়ামক পথিকৃৎ বললেও কেরীর হাতে বাংলা গদ্য তার যথার্থ রূপে উত্তীর্ণ হতে পারে নি - তা হওয়া সম্ভবও ছিল না - কারণ কেরী সেই প্রয়োজনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলা গদ্যভাষার চর্চায় অগ্রসর হননি। কেরীর অবদান এখানেই যে তিনি বাংলা কথ্য ও লিখ্য গদ্যের চরিত্রের পার্থক্যকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই গদ্যভাষার প্রথম বিন্যাসের আগ্রহে ভাষার কথ্যরূপটি গ্রহণে তিনি দ্বিধা মাত্র করেননি। তাই একথা সহজেই বলা যায় বাংলা গদ্যভাষা তার বিকাশের সঠিক পথটি পেয়েছিল কেরী সাহেবের পরিকল্পনার সূত্রেই।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষা চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে কেরী যাদের নিযুক্ত করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান - অন্যপক্ষে বাংলা গদ্যভাষার বিকাশের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল -

সজনীকান্ত দাস মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে "শিল্পী" আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।৬ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিভা এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করে। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ও সহজেই বুঝেছিলেন যে বাংলা গদ্যভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে গেলে তার গঠনগত

দিকটির প্রতি সচেতন লক্ষ্য রাখতে হয়। বাংলা গদ্যভাষার চর্চার প্রথমকালে - যদিও কেরীর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করতে হয়েছিল তাঁকে তবু মৃত্যুঞ্জয় তাঁর সহজ বোধের দ্বারা বাংলা গদ্যভাষাকে তার যথার্থ মূল্যে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কিছুটা হলেও।

আগের আলোচনায় জেনেছি কেরী গ্রন্থ রচনা করেননি সম্পাদনা করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন নানান বিষয়কে নিয়ে। আর বিষয়োচিত গদ্যভাষা রচনার কৃতিত্বটি প্রথম তাঁরই প্রাপ্য। মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই তুলনায় সহজ বিষয়কে লিপিবদ্ধ করতে তিনি আশ্রয় করেছিলেন মৌখিক ভাষার আদলটিকেই - দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে -

"শিয়াল বাঘিনীর এই কথা শুনিয়া ক্রোধে থরথর কাঁপিতে২ দাঁত কড়মড় করিয়া বাঘিনীর পানে কটমট করিয়া চাহিয়া কহিল বেদড়া মাগী উনি আর কিছু জানেন না কেবল খাবেন এই জানেন আরে মাগি ইহা কি কখন শুনিস নাই ভর্ত্তা যদি রোগী ও প্রবাসী হয় তবে ভার্যাকে গৃহব্যাপার সকলই করিতে হয়।৭

উদ্ধৃত অংশটি "প্রবোধ চন্দ্রিকা" গ্রন্থের তৃতীয় স্তবক তৃতীয় কুসুম অংশ থেকে গৃহীত। অংশটিতে ব্যাঘ্র শৃগালের প্রতীকে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে বোঝানো হয়েছে। উক্ত অংশে 'কড়মড়' , 'থরথর' 'কটমট' প্রভৃতি ধ্বণ্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা ভাষার প্রত্যক্ষ আবেদনকে ফুটিয়ে তোলার আগ্রহটি পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতিত্ব এখানেই তিনি ভাষাকে বিষয়ানুগ করতে তার সচেতন বোধকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে তাঁর সামনেও ভাষার কোনও আদর্শ রূপ সেদিন ছিল না - তবু মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় বিষয়ের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের কন্ঠস্বরের সহজ বাকভঙ্গী অনায়াসে ধরা দিয়েছে।

বাংলা লিখ্য গদ্যভাষার বিকাশ ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়ে উনিশ শতকেই আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে এল - রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায়। বাংলা ভাষার গঠন বিন্যাসটিকে প্রথম সচেতনভাবে আমাদের ধরিয়ে দেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু বাংলা ভাষা তাঁর কাছে ঋণী। মুখ্যত ধর্মচিন্তা ও সামাজিক আচার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর

বক্তব্য প্রকাশের জন্যেই তিনি বাংলা ভাষা রচনা করেন। সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় আমরা রামমোহনকে পাই প্রত্যক্ষভাবে। সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছে নানা ভাবে। একাজ করতে গিয়েই বাংলাদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বর্গের সামনে নিজের বক্তব্যকে দৃঢ়তা ও যুক্তি গ্রাহ্যতা দিতে তিনি শাস্ত্র গ্রন্থ অনুবাদে প্রয়াসী হন। এখানেই তিনি অনুভব করেন যে শাস্ত্র গ্রন্থ অনুবাদ করতে যে ভাষার প্রয়োজন হয় বাংলা ভাষা তার সেই প্রকাশ ক্ষমতাকে তখনও অর্জন তো করতে পারেই নি এমনকি বাংলা ভাষার কাঠামোটিও তখন স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়নি। তাই রামমোহন রায়ই বাংলা ভাষার কাঠামোটিকে নির্দিষ্ট করতে আগ্রহী হন। বাংলা বাক্যের গঠনে আমরা দেখতে পাই প্রথমে কর্তা মধ্যে কর্ম ও সবশেষে ক্রিয়া রূপটি বসালে বাক্যের অর্থ প্রকাশ লাভ করে - রামমোহন রায় প্রথম যিনি বাংলা গদ্যের এই অন্বয় বিন্যাসটিকে তার যথার্থ মূল্যে গ্রহণ করে বক্তার বিশেষ অভিপ্রায়কে দ্যোতনা দানে সচেষ্ট হয়েছেন - আর এর কারণটি আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি। বাংলা গদ্যের এই ক্রিয়ান্তক গঠন সম্পর্কে তার স্পষ্ট নির্দেশ আছে 'বেদান্ত গ্রন্থের' অনুষ্ঠান অংশে - "বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যেং স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিবার চেষ্টা না পাইবেন।"৮

বাংলা ভাষা সম্পর্কে রামমোহনের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা লিখ্য গদ্যভাষাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে অর্থ প্রকাশের সাবলীলতাকে বিস্তৃত করেছিল। বলা বাহুল্য যে, ভাষা সম্পর্কে সচেতন অভিজ্ঞতাই ছিল ভাষার এই রূপ প্রকৃতিটি আবিষ্কারে তাঁর প্রধান সহায়। বলা যায় যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক গোষ্ঠী তাঁদের সচেতন বোধের অভাবে বাংলা ভাষার যে রূপটি নির্দিষ্ট করে যেতে পারেন নি রামমোহন রায় ভাষা চিন্তক না হয়েও কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা ও ব্যাবহারিক বোধের প্রয়োগে ভাষাকে বিশেষতঃ বাংলা লিখ্য ভাষাকে তার নির্দিষ্ট কাঠামোগত মানদন্ডটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - "রামমোহন রায় বাংলা ভাষাকে গ্রানিট স্তরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন" গ্রানিট স্তর বলতে শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপপ্রকৃতির যে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দিতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথমেই বলেছি রামমোহন ভাষাকে শৃঙ্খলা মণ্ডিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন

ভাষাকে যুক্তি শাণিত করতে গিয়েই।

রামমোহন ছিলেন এক কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ধর্মীয় অন্ধ সংস্কারের মূলে তীব্র আঘাত হানতে রামমোহন তাঁর ভাষাকে হাতিয়ার রূপে ব্যাবহার করেছিলেন রামমোহনের ভাষা যুক্তি শানিত হয়ে উঠেছিল সেই আকাঙ্খা থেকেই। ব্যক্তি স্বভাব বৈশিষ্ট্যে কঠোর যুক্তিবাদী রামমোহন ভাষাকেও ব্যবহার করেছিলেন তার নির্দিষ্ট অন্বয় বিন্যাসকে মেনেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বাক্য হয়ে পড়েছে দীর্ঘ। দীর্ঘ জটিল বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রাঞ্জল এবং যথাযথ অর্থ প্রকাশে প্রতিবন্ধক হয়েছিল।

কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় যে এর পর ভাষাকে আর তার নির্দিষ্ট কাঠামো বা অবয়ব সন্নিধান করতে হয়নি। এরপর ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পেরেছে সানন্দে।

বাংলা লিখ্য ভাষাকে তার যথার্থ শিল্পছন্দে উত্তীর্ণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন - বিভিন্ন বাংলা শব্দের পরস্পর সমাবেশে অভিধানগত অর্থ ব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে এই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া লেখনীর মুখে তাহার সম্ভাবনাও তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।"৯

শব্দ সামঞ্জস্যে রসের প্রকাশ ঘটানো সম্ভব সৌন্দর্যের পূজারীর পক্ষেই। বিদ্যাসাগরই প্রথম যিনি শব্দের আভিধানিক অর্থকে ছাপিয়ে দ্যোতনাকে পরিস্ফুট করলেন শব্দের সুচারু ব্যবহারে। শব্দ ব্যবহার এবার নিছক প্রয়োজনের গন্ডীকে অতিক্রম করে নান্দনিকমাত্রা সন্ধানে প্রয়াসী হল - আর রবীন্দ্রনাথের অভিমতানুসারে বিদ্যাসাগর "বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী'। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় যে এক আপাত কঠিন বহিরাবরনের অন্তরালে এক শিল্পী মনের স্বচ্ছতোয়া প্রবাহিত হয়েছিল নিরন্তর তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরে। মধুসূদন বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বকে যথার্থই উপলব্ধি করে বলেছিলেন - "The man who I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man and the heart of a Bengali mother" ।১০

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বে এই বাঙালী মায়ের অন্তরঙ্গতা ও স্নেহার্দ্রতাই তাঁর ঐ শৈল্পিক মনোভঙ্গির প্রকাশে সহায়ক হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় গভীর পান্ডিত্য বাংলা ভাষাকে প্রতিক্ষণে সমৃদ্ধ করেছে। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের হাতেই ঘটেছে বাংলা ভাষার প্রথম মূল্যমান প্রাপ্তি। রামমোহন রায় বাংলা বাক্যের অন্বয়রীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করলেন - বিদ্যাসাগর সেই অন্বয়রীতির স্বাধীন ব্যবহার করে বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে - ভাষার ভিতর থেকে তার শৈল্পিক গুনাবলীকে আবিষ্কার করলেন। তিনিই প্রথম যিনি যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যাবহার করে ভাষাকে দিলেন এক অনন্য মাত্রা। তাঁর কাছ থেকেই যথার্থ লিখ্য ভাষা আমরা পেলাম। সে ভাষা সার্বিকভাবে সকল চিন্তার ভার বহনে সক্ষম - কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিদ্যাসাগর তাঁর ভাষার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন পণ্ডিত সমাজের কথ্য ভাষার উপর নির্ভর করেই। আগেই বলেছি যে কথ্য ভাষার মার্জিত রূপই লিখ্য ভাষা গঠন করে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষা সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষার মার্জিত রূপ না হয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বর্গের মৌখিক ভাষার মার্জিত রূপ হয়ে উঠল।

প্রথম পর্যায়েই বলেছি সাধুভাষা অর্থে মার্জিত, সংস্কৃত শব্দ ভান্ডারের অনুগামী - লিখ্য ভাষা। বিদ্যাসাগরের সমকালীন পণ্ডিত বর্গ তাঁদের কথ্য ভাষার ভিত্তি রূপেও এই তৎসম শব্দনির্ভর ভাষাকেই আশ্রয় করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন সেই ভাষাকেই মার্জিত করে তাঁর লেখনী মুখে স্থান দিলেন তখন যে নবতম লিখ্য ভাষার জন্ম হল সেই আসলে মার্জিত, সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষা।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, বিদ্যাসাগর তাঁর ছদ্মনামে লেখা রচনায় কিন্তু সাধুভাষার ব্যবহার করেননি। সেকালের অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজ যে ভাষার ব্যবহার করত তিনি সেই কথ্য ভাষার উপরই নির্ভর করেছেন - ছদ্মনামে তাঁর লেখা 'অতিঅল্পহইল' গ্রন্থের দৃষ্টান্তে বক্তব্য স্পষ্টতর হতে পারে -

"খুড়র লেখা দেখিয়া, বোধ হইল, বাবাজি যত জারি করেন, লেখাপাড়ায় তত দখল নাই। সংস্কৃত লিখিতে গিয়া, বিলক্ষণ ছরকট করিয়েছেন। বোধ হয়, বিদ্যাসাগরবাবু এ

ছরকট টের পান নাই ; টের পেলে এ আড়াআড়ির মুখে, খুড়কে সহজে ছাড়িতেন না। যাহা হউক সংস্কৃতে যার ভাল দখল নাই তার সংস্কৃত লেখা ঝকমারি।"১১ ছদ্মনামে লেখা দুটি গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য বিদ্রূপবিদ্ধ করা। তাই ভাষারীতিকে অনায়াসে পরিবর্তন করেছেন। উক্তির মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে লেখকের যতিচিহ্ন ব্যবহারে সচেতন বিচক্ষণতা। তিনি ছয়টি অর্ধযতি,(,) চারটি পূর্ণযতি(।) ও একটি সেমিকোলন(;) ব্যবহার করে চারটি বাক্যকে বেশ কিছু অংশে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে বাক্যের খন্ডাংশের অর্থও পাঠক মনে দ্রুত আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম মনে করিয়ে দিতে হয়, যা আগেই বলেছি - মুখের ভাষার সঙ্গে সাধুভাষার মুখ্য পার্থক্য কিন্তু তার আবেদনগত। আরও গভীর বিশ্লেষণে চোখে পড়ে ক্রিয়া ও সর্বনামেও কথ্য রূপটিও তিনি তিন জায়গায় ব্যবহার করেছেন - যার, তার এবং পেলে। এছাড়াও 'টের পাওয়া', 'ছরকট', 'ঝকমারি', 'আড়াআড়ি' ইত্যাদি নিত্যান্ত প্রতিদিনের ব্যবহার্য শব্দ তাঁর ভাষায় অনায়াসে স্থান পেয়ে গেছে। আর 'দখল' 'জারি' ইত্যাদি আগন্তুক শব্দের সাধুভাষায় প্রবেশের ছাড়পত্র নেই অথচ উদ্ধৃতাংশে তিনি তাদের সাবলীল ব্যবহার করেছেন - আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিদ্যাসাগর বিষয়ানুসারে কথ্য ভাষার রূপটিকে দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করেছেন। এবং নিতান্ত মৌখিক শব্দকে লিখ্য ভাষায় ব্যবহার করেছেন স্বচ্ছন্দে।

বিদ্যাসাগরের আলোচনা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথমতঃ তিনিই প্রথম যিনি যুক্তিপূর্ণ ভাষার ব্যবহারে মার্জিত শব্দের ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করলেন ও ভাষার অন্তলীন অর্থকে আবিষ্কার করলেন। সাধুভাষার জন্ম মুহূর্তটি নিশ্চিত হল - দ্বিতীয়ত ভাষাকে বিষয়চারী করতে গিয়ে কোথাও কোথাও কথ্য ভাষার প্রায় অমার্জিত রূপকে ভিত্তি রূপে আশ্রয় করলেন। কিন্তু তাঁর কথ্য ভাষাকে গ্রহণ করার আগ্রহের কারণটি খুঁজে দেখলে দেখা যায় এই ভাষার আবেদনের তীব্রতাকে তাঁর শিল্পী মন ধরে ফেলতে দ্বিধা করেনি - তাই বিষয়ের অনুরোধে তার সুচিন্তিত নিশ্চিত ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়েছে। কথ্য ভাষার প্রত্যক্ষতামন্ডিত লিখ্য ভাষা রূপটি গ্রহণের পথ এগিয়ে গেছে। পরবর্তী প্রজন্ম বিদ্যাসাগর কৃত সাধুভাষাকে আশ্রয়করেই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন যার ফলস্বরূপ বিশেষজ্ঞজন নির্দেশ করেছেন - "শতাব্দী পাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে।"১২ - তবু মনে হয়, কালক্রমে বিদ্যাসাগরকৃত বিদ্রূপের ভাষারূপটির মত পণ্ডিতজনের কথ্য ভাষার ভিত্তিতে চলিত গদ্যভাষা তৈরি হলেও হতে

পারত ; কিন্তু তার আগেই ভাষার ইতিহাসে দেখা দিল অন্য প্রতিক্রিয়া।

বাংলা লিখ্য ভাষা যে মৌখিক ভাষার নিকটবর্তী হওয়া উচিৎ আর তা হলেই যে ভাষা সর্বজনবোধগম্যতা প্রাপ্ত হবে একথা প্রথম সচেতন ভাবে অনুভব করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

ইয়ং বেঙ্গল সমাজের প্রতিভূ ইংরাজী ভাষায় দক্ষ প্যারীচাঁদ বুঝেছিলেন যে বিদ্যাসাগর লিখ্য ভাষা রূপে যে ভাষার জন্ম দিয়ে গেলেন, বিদ্যাসাগর - পরবর্তী লেখক গোষ্ঠী সে ভাষাকে অসন্দিগ্ধ চিত্তে ব্যবহার করেছে, তাদের রচনায় - আসলে সে ভাষা কৃত্রিম, মার্জিত, পরিশীলিত, সংস্কৃতানুসারী। লিখ্য ভাষা রূপে সে ভাষা সর্বজনবোধ্যই নয়। তাই ভাষা সচেতন প্যারীচাঁদ দেশের সকল স্তরের বিশেষতঃ মহিলা পাঠক বর্গের বোঝার উপযুক্ত ভাষা রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। সেই প্রচেষ্টারই প্রথম ফসল 'মাসিক' পত্রিকা প্রকাশ, দ্বিতীয় পর্যায়ে "আলালের ঘরের দুলাল" : - যে গ্রন্থে ভাষাকে মৌখিক ভাষার নিকটবর্তী করে গড়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। মাসিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যার শুরুতেই লেখা থাকত - "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথা বার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"১৩ প্যারীচাঁদ মিত্রের এই ভাষা বোধই বাংলা চলিত গদ্যের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মোড় ফিরিয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে আমরা তাঁর এই উদ্যোগের বিস্তারিত আলোচনা ও মূল্যায়ন করব।

এই মাসিক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় 'আলালের ঘরের দুলাল'। এই গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন - "উহাতেই প্রথম এ বাংলাদেশে প্রচারিত হইল যে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। সে রচনা সুন্দর এবং যে সর্বজন হৃদয় গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়ী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ"১৪ বঙ্কিমের ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা বলতে পারি, 'সর্বজন হৃদয় গ্রাহিতা'কেই প্রতিষ্ঠা দিতে মুখের ভাষার লিখ্য ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন বিশ্লেষণ করে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে -

"বাবুরাম বাবু দুটো চক্ষু কটমট করিয়া বলিলেন - তোবেটার বড় মুখ বেড়েছে - ফের যদি এমন কথা কবি তো ঠাস্ করে চড় মারবো। বাঙ্গালি ছোট জাতিরা একটু ঠোকর খাইলেই ঠক২ করিয়া কাঁপে, হরি তিরস্কার খাইয়া জড়সড় হইয়া বলিল - এজ্ঞে না বলি এখন কি নৌকা পাওয়া যায় ? এই বলতে ২ একখানা বোট গুণ টেনে ফিরিয়া যাইতেছিল, মাঝির সহিত অনেক কস্তাকস্তি ধস্তাধস্তি করিয়া ।।০ ভাড়া চুক্তি হইল - বাবুরাম বাবু চাকর ও পাইকের সহিত বোটের উপরে উঠিলেন"।১৫ এই অংশটি আমরা গ্রহণ করেছি কেননা এখানে যেমন প্যারীচাঁদ মিত্রের সচেতন ভাষা নির্মাণ প্রচেষ্টার নিদর্শন আছে তাঁর বিবৃতিতে, অন্যদিকে সরাসরি কথ্য ভাষা উঠে এসেছে সংলাপে। সংলাপে কথ্য ভাষা অনিবার্য হলেও বিবৃতিতেও তিনি কথ্য ভাষাই ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তার প্রকাশই লক্ষ্য করার মত। উক্ত অংশে আমরা দেখি কিছু বিদেশী শব্দ যেমন- বোট, কস্তাকস্তি, চাকর, পাইক ইত্যাদি শব্দ স্থান পেয়েছে অনায়াসে - আর সর্বত্র বাক্যের আবেদনটিও প্রত্যক্ষ। কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে প্যারীচাঁদ কথ্য বাংলার ক্রিয়ারূপটি সংলাপে ব্যবহার করলেও বিবৃতিতে করেননি। আসলে প্যারীচাঁদ শেষ পর্যন্ত কথ্য ভাষার অবিকৃত রূপ ব্যবহারে কোথাও হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষাকেই গ্রহণ করেছিলেন, গ্রন্থের শেষ অংশে তার প্রমাণও বর্তমান - "মতিলাল ভগিনী ও বিমাতাকে প্রণাম করিয়া আপন পত্নীকে দেখিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়াতে রোদন করিয়া বলিলেন - মা আমি যেমন কুপুত্র, কুভ্রাতা তেমনি কুস্বামী - এমন সৎস্ত্রীর যোগ্য আমি কোনও প্রকারেই নহি।"১৬ অস্বীকার করা যায় না যে উদ্ধৃতাংশে বাক্যের গঠন ও আবেদন সাধুভাষা তথা বিদ্যাসাগরীয় ভাষার অনুগামী। কথ্য ভাষার সুচারু ভঙ্গিমাটি উদ্ধৃতাংশে অনুপস্থিত যা পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে অনেকাংশে বর্তমান ছিল। এমনকি মতিলালের সংলাপেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। পরিবর্তিত মতিলালের অন্তরের পরিবর্তনজনিত গভীর ভাব লেখককে হয়তো আকৃষ্ট করেছিল বিদ্যাসাগরের ভাষার প্রতি। একেই আগে দ্বিধা বলতে চেয়েছি।

আসলে প্যারীচাঁদ কথ্য ভাষার আবেদনটির কথা অনুভব করতে পারলেও তাঁর লেখনী তাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। প্যারীচাঁদের ভাষা বোধ পরিচ্ছন্ন ছিল না - তবে "সাহিত্যিক গদ্যকে সাধারণ জীবনের সান্নিধ্যবর্তী করার অতি আধুনিক আগ্রহ তাতে অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছিল।"১৭ আমাদের কথা, ভাষাকে জীবন সান্নিধ্যবর্তী করার

আগ্রহের যে প্রয়াস প্যারীচাঁদ প্রথম করেছিলেন তাঁর সেই প্রয়াসের পূর্ণতর প্রকাশ আমরা দেখেছি পরবর্তীকালে।

কিন্তু আমরা বলেছি যে পরিচ্ছন্ন ভাষাবোধের অভাবে প্যারীচাঁদ তাঁর ভাষাকে যোগ্য প্রকাশ ক্ষমতা দান করতে পারেননি। আর প্যারীচাঁদের এই অসংলগ্ন ভাষা ব্যবহারই হয়ত মধুসূদনের মত প্রচন্ড ব্যক্তিত্বকে এই ভাষা ব্যবহারে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য করেছিল। কারণ আমরা জানি মধুসূদন প্যারীচাঁদের এই ভাষাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। প্রায় সরাসরি দ্বন্দ্বে উপস্থিত হয়ে তিনি বলেছিলেন - "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন ? - লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা - হয় পরিয়া আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে ; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে, সে বেশে যাওয়া চলে না। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি দেখিতেছি 'পোষাকী'র পাঠ তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাহিরে সভা সমাজে সর্ব্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি সম্ভব !১৮

স্পষ্টই বোঝা যায় চলিত ভাষাকে সাহিত্যর সৃষ্টির মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মধুসূদনের দ্বিধা ছিল - কিন্তু আমরা দেখেছি সংস্কৃতানুসারী ভাষা গ্রহণে আগ্রহী মধুসূদনও কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রহসনে আটপৌরে গদ্য ভাষাকেই (ইয়ং বেঙ্গল সমাজের) আশ্রয় করলেন - এখানেও আগ্রহ ছিল কথ্য গদ্যের ব্যবহারে সংলাপের আবেদনকে স্পষ্টতর করা। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে - দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নবকুমারের সংলাপ---

"নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও - ব্রান্ডি ল্যাও জলদি।
বৈদ্য। আজ্ঞে, এই যাই।
নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা - ওলড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে ?
আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনোই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না। বুড়ো একবার চোখ বুজলে হয়, তাহলে আর আমাকে কোন শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে ? হা, হা, হা ওন্ট আই এঞ্জয় মি সেলফ ? (উচ্চ শ্বরে) ল্যাও-মদ ল্যাও।"১৯

প্রথমেই বলতে হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই রক্ষণশীল সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মের প্রতিবন্ধকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এক যুবক গোষ্ঠী

তৎপর হয়ে উঠেছিল - যাদের ইয়ং বেঙ্গল বলা হতো। পাশাপাশি তাদেরই একদল যারা ইংরাজী সভ্যতার ক্ষতিকর দিক গুলিকেই আশ্রয় করেছিল - সৎ সংস্কারকে আশ্রয় করেননি। এরা বাংলা ইংরাজী মিশ্রিত এক অদ্ভুত ভাষার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল - বাংলা বলাকে নিন্দনীয় মনে করতেও দ্বিধা ছিল না তাদের। মধুসূদন তার প্রহসনে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাকেই ব্যাবহার করেছিলেন সচেতনভাবে -প্রয়োজনে।

উক্ত উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত ইংরাজী সংলাপ ঐ জাতীয় ইয়ং বেঙ্গলের ভাষার উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ। মধুসূদন তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজ চেতনার দ্বারা বুঝেছিলেন - এই সমাজকে যদি ব্যঙ্গের চাবুকে জর্জরিত করতে হয় তবে তাঁর সহজতম পথ তাদের আচার ব্যবহারকেই তাদের সামনে তুলে ধরা। কিন্তু একাজ করতে গিয়েই মধুসূদন বাংলা কথ্য ভাষার ব্যবহারকে আরও এক ধাপ অগ্রসর করে দিয়েছিলেন - আগেই বলেছি যদিও তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে কথ্যভাষার অবিকৃত ব্যবহার নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন - কিন্তু প্রহসনে কথ্য ভাষার ব্যবহার করলেন। না হলে এই প্রহসনে ইয়ং বেঙ্গলের জীবন্ত স্বভাব ধরা দিত না। এ ক্ষেত্রে তিনি বিষয়ের সঙ্গে ভাষাকে প্রাসঙ্গিক করেছেন। এ ভাষা স্ট্যান্ডার্ড কলোকুয়্যালের কাঠামোধৃত হলেও প্রহসনের উপযুক্ত কিন্তু এই কথ্য ভাষাকে ভিত্তি করে সর্বগ. সকল ভাবপ্রকাশ - সমর্থ ভাষা তৈরী করা যায় না।

চলিত বাংলা গদ্যভাষাকে সচেতন ও সার্বিকভাবে সাহিত্যে প্রয়োগ করলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তার 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় তিনি লিখেছেন -"পাঠক গণ ! এই যে উর্দ্দি ও তকমাওয়ালা বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখচেন, এঁরা বড় ফেলা যান না, এরা পয়সা পেলে না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই ! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্ছেন ! পয়সা দিলে বানরওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোষাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায় ; কিন্তু এরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্যন্ত সেজে নাচেন ! যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম এই দলের ভেতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবেন না।"২০

বাক্যে ক্রিয়াপদের বা সর্বনামের চলিত রূপটিক কথা বাদ দিলেও একথা স্পষ্টই বলা যায় যে উক্ত অংশের বক্তব্য চলিত ভাষার প্রত্যক্ষ আবেদন মণ্ডিত। বাক্যকে

যতিচিহ্নের দ্বারা হ্রস্ব করে মৌখিক ভাষার আবেদনটি স্পষ্ট করার আগ্রহই বাক্যের প্রত্যক্ষতাকে সজীব প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

কিন্তু নির্বিশেষে লক্ষ করা যায় প্রতিটি বাক্যে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা অত্যন্ত স্পষ্ট। লেখক সমগ্র গ্রন্থেই বাঙালী সমাজকে বিদ্রূপ করেছেন - স্বভাবতই ভাষায় তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট ছাপ - কালীপ্রসন্ন আসলে চলিতভাষাকে ব্যবহার করলেও সচেতনভাবে ব্যঙ্গ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল - তাই সার্বিকভাবেই এ ভাষা ব্যঙ্গের ভাষারূপে প্রতিভাত হয়েছে। প্রসঙ্গত আরও একটি কথা বলে নিতে হয় যে বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রণে ধীরে ধীরে এই চলিত গদ্য তার নিজস্ব রূপ পেয়েছে - সাধুভাষায় যে নিয়ন্ত্রণ আমরা বিদ্যাসাগরের রচনায় পেয়েছি - বঙ্কিম যাকে আরও স্বচ্ছন্দ করেছেন। আমাদের বক্তব্য, এই চলিত গদ্য সর্বত্রগামী নয় কিন্তু নানারূপে ব্যবহার হতে হতে স্বচ্ছ ভাবে ব্যক্তিত্বের চিহ্নকেও এভাষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়ে উঠছে এই পর্যায়েই। চলিত ভাষাকে এক নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করেও লেখক দেখিয়ে দিলেন যে এই ভাষাই সাহিত্যে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টিতে যথেষ্ট সক্ষম।

আমাদের মনে রাখতে হবে, কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতার এক বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ শ্রেণীর মানুষের কথ্য ভাষার ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছেন তাঁর নকশা। বিদ্রূপ তাঁর লক্ষ্য - সচেতনভাবে ভাষা রচনা করে সর্বজনের কাছে গদ্যকে অনায়াস করার প্রচেষ্টা তাঁর ছিলই না - তবু তাঁর ভাষা প্রত্যক্ষতার গুণে চলিতভাষার ইতিহাসে সবিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। একটা কথা এখানে হয়তো প্রমাণ পেয়ে গেল - মুখে মুখে ব্যবহৃত যে প্রবহমান ভাষারূপ অবিকৃতভাবে সাহিত্যের বাহন হতে পারে, তা ব্যঙ্গমূলক রচনায় হলেও তার তাৎপর্য আছে। প্যারীচাঁদ যে চেষ্টা করে সফল হননি - সেই উদ্যোগের এটি যেন দ্বিতীয় পর্যায়। কিন্তু যে চলিত গদ্যভাষা সব রকমের ভাবকে প্রকাশ করতে পারবে তার প্রত্যক্ষ স্বভাবটি বজায় রেখে - সেই গদ্যের প্রকাশ আকাঙ্খা স্বভাবতই এবার তীব্রতর হতে লাগল। মধুসূদন নাটকের সংলাপে কথ্য ভাষার অবিকৃত প্রকাশ ঘটিয়েছেন, বিবৃতির ভাষার প্রয়োজন নাটকে নেই। বিষয়ের চাহিদায় ভাষা যথাযথ হল। কিন্তু উনিশ শতকে প্রচলিত এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর এই বাক্‌ভঙ্গি আদর্শ বা শিষ্ট চলিত বা সাহিত্যিক চলিত সৃষ্টি করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক, কারণ এতো বিকারগ্রস্ত প্রজন্মের ভাষা। আমাদের বলার কথা, ভাষার কথ্যরূপের নানা রকমের প্রকাশ কিন্তু ভবিষ্যতের আকাঙ্খাকেই ক্রমশঃ সূচিত

করছিল - তার আরও একটা পর্যায় নির্মিত হল - হুতোমের সৃষ্টিতে। পূর্ণ সম্ভাবনায় তাকে পেয়েছি -রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - তবু তাঁরও তো প্রথমে দ্বিধা ছিল। এবার সে আলোচনায় আসা যেতে পারে।

প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগ ও আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রথম চলিত গদ্যে সাহিত্য রচনা করলেও চলিত গদ্যই যে সাহিত্য রচনার একমাত্র বাহন হওয়া উচিত এ ব্যাপারে প্রথমাবধি তিনি তাঁর স্পষ্ট মত পোষণ করেছেন।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের ভাষার বনিয়াদ ছিল ঠাকুরবাড়ির এক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল জাত কথ্য ভাষা। বলার অপেক্ষা রাখে না, সে ভাষা সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষা ছিল না। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনে সাহিত্য রচনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন - ঠাকুরবাড়ির ভাষাকেই। কিন্তু ভাষা সম্পর্কে সার্বিক চিন্তাই তাঁকে চলিত ভাষার প্রতি একনিষ্ঠ করেছিল - 'সবুজপত্র' পত্রিকার উদ্যোগে তাই রবীন্দ্রনাথ সাড়া দেন সর্বাগ্রে।

আমরা বলতে চাই চলিত লিখ্য ভাষাকে একটি আদর্শ বা মান্য রূপ প্রাপ্ত হতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে, বাঙালী পাঠকের কাছে যা গৃহীত হয়েছে নির্দ্বিধায়। দৃষ্টান্তে মন্তব্যের যথার্থতা নির্ণীত হতেই পারে - কিন্তু তারও আগে বলে নিতে হয় রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষাকে লিখ্য ভাষায় প্রয়োগ করেছিলেন 'সবুজ পত্র' পত্রিকা প্রকাশের আগেই 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' বা 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরীতে'। পত্রের ভাষা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছিলেন - "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিৎ সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনের সহিত মুখোমুখি এক ভাষায় কথা কহা ও তাহার চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।২১

শুধু পত্রের ভাষা সম্বন্ধে নয় চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠার আগ্রহে তিনি আরও বলেছিলেন - "আমার বিশ্বাস বাংলা চলিত ভাষার সহজ প্রকাশ পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"২২

আমরাও বলি. চলিত ভাষার এই 'প্রকাশ পটুতাই' তাকে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা দান করেছে লিখ্য চলিত ভাষারূপে।

কিন্তু এই ডায়েরী বা পত্রের ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে চলিত গদ্য ভাষা রূপে মেনে নিয়েও বলা যায় - পত্র বা ডায়েরীতে মানুষ প্রায় মুখে মুখে বলা কথা ব্যবহার করতেই পারে। এই ভাষা সব ভাবনার বাহন হয়ে ওঠে যখন. তখনই তো অগ্নিপরীক্ষা হয়। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সেই প্রকাশে স্ব-স্থ হয়েছেন। তাই এই ক্রমবিকাশেরও পূর্ব সম্ভাবনা পাওয়া যায় - 'যুরোপ যাত্রীর ডায়রি'তেই - "ইংরেজ মেয়েদের চোখ আমার ক্রমে ভালো লাগছে - মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো এমন পরিষ্কার এবং উজজ্বল. প্রায়ই ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন। আমাদের দেশের মেয়েদের চোখে এক রকম আবেশের ভাব আছে. এদের তা মোটে নেই।" ২৩ আমাদের বক্তব্য এই ভাষারূপটি পরে তাঁর লেখনীতে যথাযথ মর্যাদায় গৃহীত হয়েছে সব ভাবনার বাহন রূপে। সচেতনভাবে চলিত গদ্যে লিখিত 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' (১৯১৫ খ্রীঃ) উপন্যাসের ভাষাও চলিত লিখ্য গদ্য ভাষার আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারেনি।

বাংলা চলিত ভাষার 'সহজ স্বভাবের' কাঠামোটি সুচারু রূপে তাঁর লেখনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'যোগাযোগ' উপন্যাস (১৯২৯খ্রীঃ) রচনাকালে।

"অন্তঃপুরে একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠোনে আবর্জনা সেখানে জলের কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলছেই। যখন ব্যবহার নেই তখনো কল প্রায় খোলাই থাকে। উপরের বারান্দা থেকে মেয়েদের ভিজে কাপড় ঝুলছে আর দাঁড়ের কাকাতুয়ার উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উঠোনে।"২৪

বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অবহেলিত প্রায় 'অন্তঃপুরের একতলাটি আমাদের চোখের সামনে চিত্রস্বরূপ ফুটে ওঠে। এখানে চলিত ভাষার স্বভাবের আবেদনগত প্রত্যক্ষতার কারণেই তা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এখানে বাক্য বিন্যাস একটি সম্পূর্ন ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। প্রায় মুখে বলা কথার মত করে ভাষার বিন্যাস ত্বরিতগতিতে পাঠকমনে বর্ণনার চিত্রটি মুদ্রিত করে দেয়। এখানেই চলিত লিখ্য গদ্য ভাষার 'সহজ প্রকাশ পটুতা'। এ তো

অন্তঃপুরের চিত্র, আবার 'যোগাযোগ' উপন্যাসেই মধুসূদনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেন লেখক ঐ ভাষার 'সহজ প্রকাশ পটুতা'য়।

"মধুসূদন মনে মনে হাসলেন। আংটির উপর বিলক্ষণ লোভ দেখছি। এইখানে, নিজের সঙ্গে কুমুর সামর্থের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল। বুঝলেন সময়ে অসময়ে সিঁথি কন্ঠহার বালা বাজুর যোগে অভিমানিনীর সঙ্গে ব্যবহারের সোজা পথ পাওয়া যাবে, ঐ পথে মধুসূদনের প্রভাব না মেনে উপায় নেই, . . ." ২৫

অহংকার-প্রমত্ত হেরে যাওয়া মধুসূদনের প্রতিশোধ আকাঙ্খাপীড়িত মনটির ত্বরিত উন্মোচন সম্ভব হয়েছে বর্ণনায় যথার্থতায়। একেই তো ভাষার প্রত্যক্ষতা বলা যায়। শব্দের অন্বয়ে, বাক্যের বিন্যাসে পাঠকের সামনে চরিত্রের মনের গভীর তলদেশটিকে পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে যায়। মধুসূদন তো কেবল প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে ওঠেনি - কুমুর বিপরীতে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দৈন্যের ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপটুকু বুলিয়ে দেওয়ার নিষ্ফল আকাঙ্খা করেছে - চলিত ভাষা কিন্তু এবারে অনায়াসে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশ করেছে - বিষয়ের গাম্ভীর্য কোথাও তার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি।

প্রসঙ্গত বলে নিতে হয় 'যোগাযোগ' রচনা কালেই রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষাকে লিখ্য ভাষারূপে তাঁর রচনায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে তিনি ভাষার আদর্শ রূপটিকে আশ্রয় করতে পেরেছিলেন, যা তিনি ডায়েরী বা পত্র রচনা কালে সম্পন্ন করতে পারেননি। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' বা 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী'র ভাষা চলিত ভাষা, ঐ ভাষা ডায়েরী বা পত্রের বিষয়ের সঙ্গে মিলে যায় কিন্তু এই প্রত্যক্ষ আবেদনবহ ভাষা সর্বত্র ব্যবহার করতে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেন প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চলিত লিখ্য ভাষার যে আদর্শটি নির্মান করে দিলেন পরবর্তীকালের লেখকগণ সেই ভাষার আদর্শকে অনুসরণ করেই তাকে নিজের মনন ও ব্যক্তিত্বের ভাব প্রকাশক্ষম করে নিতে পেরেছে - পাঠক ভাষায় পেয়েছে তার আকাঙ্খিত তৃপ্তি। পরবর্তীকালে কৃত গবেষণা নিবন্ধেও এই ভাবনার সমর্থন মেলে - "রবীন্দ্রসৃষ্ট এই ভাষা বাংলা লিখ্য গদ্যের সাধু, চলিত দুই রূপেই পরবর্তীকালের আদর্শরূপে বহুলাংশে গণ্য

হতে পেরেছে।"২৬

রবীন্দ্রনাথের পরেই একক শিল্পীরূপে মনে আসে অবনীন্দ্রনাথের কথা। অবনীন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন চিত্রশিল্পী। ভাষা সম্বন্ধীয় ভাবনা চিন্তার অবকাশ ছিল না তাঁর। বাংলা চলিত লিখ্য ভাষাকে এক অন্যোন্য শ্রীমণ্ডিত করেছিলেন তিনি তাঁর নিজের প্রবণতায়। তার চিত্রী ব্যক্তিত্বই চলিত ভাষার চিত্রময়তাকে আবিষ্কার করেছিল - প্রতিষ্ঠা করেছিল এক নতুনতর মাত্রায়। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মেয়ে মহলের কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করে - তাঁর সাহিত্য কর্মে চলিত ভাষার যে স্বচ্ছতাকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন - সে ভাষা অননুকরণীয়ই রয়ে গেল - তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে।২৭ অবনীন্দ্রনাথ 'নালক'-এ লিখেছেন - "সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে 'ভিক্ষা দাও' বলে দাঁড়ালেন : ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে, চোখ মেলেই দেখছে - নবীন সন্ন্যাসী ! এত রূপ, এমন করুণামাখা হাসি মুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে, এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে, অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে, চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে কেউ কোনদিন সে নগরে আসে নি !"২৮

চলিত লিখ্য ভাষার প্রত্যক্ষ আবেদনমণ্ডিত এ এক অনন্যসাধারণ ভাষা। দীর্ঘ বাক্যে ছোটদের উদ্দেশ্যে গল্প বলছেন লেখক, কিন্তু পরিণত পাঠক বুঝতে পারবেন - বাক্যে অর্ধবিরতি (,)সেমিকোলন (;) ড্যাশ (-) ব্যবহার করে তুলির ছোট ছোট টান সম্পন্ন করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের অবতারণা করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) সিদ্ধার্থকে দেখে নগরবাসীর বিস্মিত আনন্দের প্রকাশ - কথা ব্যবহারের অবকাশও রাখল না। অথচ পড়ামাত্র এ ভাষা চেতনায় মুদ্রিত হয়ে যায়। এভাবে দেখার চোখ না থাকলে এ ভাষা রচনা করা যায় না। চিত্রী-ব্যক্তিত্বের এই ভাষা তাই অনুসরণযোগ্য হল না অনিবার্যভাবে। অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের গদ্যেও একই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন - "ধাতু ও প্রত্যয় একত্র হল তবে পেলাম শব্দরূপটি কথিত ভাষায়। চিত্রিত ভাষাতেও এই নিয়ম। ধড়, মাথা -হাত-পা ইত্যাদি নিয়ে এক ধাঁচের একটা কাঠামো প্রস্তুত করা গেল কিন্তু কাঠামোটা নরের নারীর অথবা বানরীর বোঝানো দুষ্কর হল 'প্রত্যয়' দিয়ে রূপটাকে বিশেষিত না করলে।"২৯

এখানে শব্দ ও বাক্যের গঠন মুখের ভাষার, লেখার কারণেই তাতে পারিপাট্য যোগ হয়েছে - তাতে অর্থবোধ প্রচেষ্টাসাধ্য হয় নি।

পরিশেষে আসে লেখক প্রমথ চৌধুরীর প্রসঙ্গ, যাঁর আগ্রহেই - প্রধানত বাংলা চলিত গদ্যে সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ ব্রতী হয়েছিলেন। তবে বলতেই হয় যে প্রমথ চৌধুরীর ভাষাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলিত গদ্যের অব্যবহিত আবেদন সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। সে ভাষা বুদ্ধিজীবিতার ঔজজ্বল্যে মার্জিত আবার শানিত। বাংলা ভাষার ইতিহাসে সে-ও এক নতুন দিক নির্ণায়ক চিহ্ন। যদিও একথা সত্য যে ব্যাকরণগত দিক থেকে সে ভাষা চলিত ভাষা। তবে আবেদনগত দিক থেকে তাকে হয়ত প্রমথীয় ভাষাই বলা চলে। কারণ লেখকের ব্যক্তিত্বের সার্বিক চিহ্ন সে ভাষা দেহে তীব্রভাবে উপস্থিত। প্রমথ চৌধুরী 'চার ইয়ারী কথায়' লিখেছেন (চৈত্র ১৩২২ - জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩) - "আমার মনে যে সুখ ছিল না সোয়াস্তি ছিল না তার কারণই তো এই যে, আমার মন সংসার থেকে আলগা হয়ে পড়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, আমার মনে বৈরাগ্য এসেছিল ; অবস্থা ঠিক তার উল্টো। জীবনের প্রতি বিরাগ নয়, আত্যন্তিক অনুরাগবশতই আমার মন চারপাশের সঙ্গে খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল।"৩০ -- এই ভাষা ব্যাকরণের মতে চলিত কিন্তু স্বভাবত সাধু। বাক্যের গঠনের বিশেষত্ব মৌখিক গদ্য থেকে দূরবর্তিতা প্রমাণ করে। সর্বোপরি বুদ্ধিমার্জিত শব্দ প্রয়োগ প্রতি পদক্ষেপে ভাষাকে ধীর স্থির পর্যালোচনায় বুঝে নিতে আগ্রহী করে। এছাড়া এ ভাষার অর্থবোধ সম্ভবই হয় না। একেই লেখকের ব্যক্তিত্বের মুদ্রণ বলেছি। ব্যক্তি স্বভাবেও প্রমথ চৌধুরী এইরকমই ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাষায় এই গুণ আরও প্রকট।

তাই বলেছি, গদ্য ভাষার ইতিহাসে সে এক নতুন পথের দিশা ধরিয়ে দিয়েছে - আগামীদিনের গবেষণায় এই ভাষার স্বরূপ ও সৌন্দর্য উন্মোচিত হতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায় গ্রন্থ নির্দেশ

১। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে - সজনীকান্ত দাস লিখিত কথোপকথন গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২। উইলিয়ম কেরী - কথোপকথন - পৃঃ- ৭৩

৩। উইলিয়ম কেরী - PREFACE - কথোপকথন - পৃঃ- ২৫

৪। তদেব - পৃঃ-২৫

৫। তদেব - পৃঃ-২৫

৬। সজনীকান্ত- বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস - পৃঃ- ১৭৭

৭। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার - প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮৩৩) - অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন - পৃঃ - ২৭১

৮। রামমোহন রায় - বেদান্ত গ্রন্থের অনুষ্ঠান অংশ - রামমোহন গ্রন্থাবলী (১৯৭৩) - পৃঃ- ৭

৯। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় - বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী - ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়) পৃঃ- ১২৫

১০।ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর - সাহিত্য সাধক চরিতমালা।

১১।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর - 'অতি অল্প হইল' - প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত - বিদ্যাসাগর - রচনা সম্ভার - পৃঃ- ৩৪৪

১২। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় - বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী - ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়) - পৃঃ - ১৪২

১৩। মাসিক পত্রিকার সূচনা - Susil Kumar De - Bengali literature in Nineteenth Century (1962) P- 603

১৪। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান - ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়) - পৃঃ- ৩৫২

১৫। প্যারীচাঁদ মিত্র - আলালের ঘরের দুলাল - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ - পৃঃ-১১

১৬। তদেব - পৃঃ- ১৪১

১৭। শ্রী ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়) - পৃঃ-৩২৭

১৮। নগেন্দ্রনাথ সোম - মধুস্মৃতি - পৃঃ- ৮২ -৮৩

১৯। মধুসূদন দত্ত - একেই কি বলে সভ্যতা - মধুসূদন রচনাবলী - ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত পৃ-২৫৩ভ

২০।হুতোম প্যাঁচা(কালীপ্রসন্ন সিংহ)-হুতোম প্যাঁচার নকশা - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পৃঃ-৮৯

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র - গ্রন্থপরিচয় - রবীন্দ্র রচনাবলী ১ -বিশ্ব ভারতী- পৃঃ-৯৬২

২২। তদেব - পৃঃ-৭৯০

২৩।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি - রবীন্দ্র রচনাবলী (পঃ.বঃ) - খন্ড-১২ - পৃঃ-১১৯

২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - যোগাযোগ - পৃঃ- ৫৬

২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - যোগাযোগ - পৃঃ- ৫২

২৬। ড. অপর্ণা চক্রবর্তী - অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ "অবনীন্দ্রনাথের গদ্য শিল্প : রূপ ও রীতি" পৃঃ- ৮৫

২৭।বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য - শ্রী ভূদেব চৌধূরি - 'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' ১ম প্রকাশ ১৩৮০

২৮। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - নালক - অবনীন্দ্র রচনাবলী (২য় খন্ড) - পৃঃ - ৩০৯-৩১০

২৯। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - "তৃতীয় প্রবন্ধ - শিল্পায়ন (২য় সংস্করণ) - পৃঃ - ২৫-২৬

৩০। প্রমথ চৌধুরী - চার ইয়ারী কথা - গল্প সংগ্রহ - পৃঃ- ২২

গদ্য ভাষার চলিত রীতি পরিগ্রহণের ঐতিহাসিক রূপরেখাটির সামগ্রিক মূল্যায়ন

বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাসটি পরিক্রমার পথে লক্ষ্য করা যায় - নানা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলা চলিত ভাষা লিখ্য ভাষা রূপে গৃহীত হয়েছিল। আন্দোলন অর্থে বোঝাতে চাইছি - চলিত ভাষার স্বভাবনিহিত প্রত্যক্ষতায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে সার্বিক রূপদানের আকাঙ্খা ও আগ্রহকে ।

আমরা দেখেছি - প্রাথমিকভাবে বাংলা লিখ্য ভাষা রূপে সাধুভাষার জন্ম। অথচ সে ভাষা কৃত্রিম, সংস্কৃতানুসারী, ধীর, স্থির, মননসাপেক্ষ। কিন্তু ভাষার আটপৌরে স্বভাবটিও একই কালে শিক্ষিত বাঙালীর যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। স্বভাবতই সাধুভাষা ব্যবহারের প্রতিপক্ষে এই আটপৌরে সহজ ভাষার ব্যবহারের আগ্রহ খুব জোরালোভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল উনিশ শতকের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর ভাষা রচনার উদ্যোগে। এই কারণেই তা ভাষা আন্দোলনরূপে চিহ্নিত হয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

বাংলা চলিত গদ্যকে সচেতনভাবে লিখ্যভাষার মর্যাদা দান করতে চেয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। সাধুভাষা সকল পাঠকের বোধগম্য ছিল না - তাই সমাজের সকল স্তরের বিশেষ করে ; অল্পবিস্তর সংবেদনশীল মানুষের কাছে বিশেষতঃ মহিলা পাঠকের কাছে সাহিত্যকে পৌঁছে দিতে তিনি 'মাসিক' পত্রিকা প্রকাশ করেন - একথা আগেই বলেছি। মাসিক পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'আলালের ঘরের দুলাল' - চলিত গদ্যভাষার চিহ্ন বহনকারী প্রথম নক্সাজাতীয় রচনা। সেই সময়ে চলিত গদ্যভাষাকে লিখ্য ভাষার মর্যাদা দেওয়া সহজ হয়নি। কারণ সাধুভাষায় সৌন্দর্যের প্রকাশ ক্ষমতাও বিস্ময়কর ছিল। শিক্ষিত পাঠকবর্গের কাছে আজও সে ভাষা সমান আদরনীয় - একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তৎকালীন শিক্ষিত পাঠক কাঙ্খিত মার্জিত ভাষা রূপে সাধুভাষাকেই গ্রহণ করেছিল - কারণ সাধুভাষার আবেদন উচ্চশিক্ষিতের কাছে বুদ্ধি গ্রাহ্য

হলেও তার আবেদনকে গ্রহণ করতে তাদের অসুবিধা ছিল না - অন্যতর আর একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে - সাধুভাষাকে সাহিত্য রচনার মাধ্যম রূপে যাঁরা ব্যবহার করেছিলেন সাহিত্যকে সকল স্তরের পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যও হয়ত তাঁদের ছিল না - অথবা সচেতনভাবে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকে সকল স্তরের পাঠকের কাছে পৌছানোর কথা ভাবেনইনি। তৃতীয়ত- চলিত ভাষায় যে আবেদনগত প্রত্যক্ষতার কথা - বার বার বলেছি, সেই সময়ের লেখকবর্গ তাকে অপরিণত অবস্থায় পেয়ে সেই ভাষা ব্যবহারে উৎসাহিত হতে পারেননি - তবে কোনও কোনও লেখক ছিলেন - যারা তাদের সচেতন ব্যবহারিক বোধ থেকে চলিতভাষার প্রত্যক্ষতাকে গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।এই আগ্রহ পরবর্তি কালে প্রত্যয়ে পরিনত হয়েছিল। সমালোচনার মুখে তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব টলে যায়নি একটুও। প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আলালী ভাষার সম্বন্ধে মধুসূদনের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাই উত্তেজিত প্যারীচাঁদ বলেছিলেন - "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে ? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত ও চিরস্থায়ী হইবে !"১

একথা সত্য যে আজ সাহিত্য রচনার ভাষা রূপে চলিত গদ্যভাষার প্রচলন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ভাষাবোধের অভাবের কারণে প্যারীচাঁদ মিত্রের পক্ষে চলিত ভাষাকে লিখ্য ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া প্রথম রচনাতেই সম্ভবপর হয়নি। অথচ কালীপ্রসন্নের একক প্রচেষ্টায় যার সাবলীল রূপ পেয়েছি। যদিও তা বিশেষ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে নিয়োজিত। উনিশ শতকের চলিত ভাষা রচনার ইতিহাস - ইতিহাসের বিচিত্র ধারাকে কিভাবে বিস্ময়কর করেছিল পর্যালোচনার মাধ্যমে সে তথ্য প্রাপ্তি এই কারণেই কৌতূহলান্বিত হয়ে ওঠে।

এরপর বাংলা চলিত গদ্যভাষা লিখ্য ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে প্রমথ চৌধুরীর দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রচেষ্টায় ; এটি চলিতভাষা রচনার দ্বিতীয় ও শেষ আন্দোলন। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন ". . . মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিৎ কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা ঐক্য নষ্ট করা নয়।"২

সচেতন ভাবেই চলিত গদ্যভাষাকে প্রমথ চৌধুরী লিখ্য ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন - প্রসঙ্গত তাঁর যুক্তিও ছিল ক্ষুরধার - বলেছিলেন - "বিচার না করে একরাস সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষা এখন শানিয়ে ধার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়।"৩

সাধুভাষার ভার ও চলিত ভাষার শানিত ধার সম্পর্কে সচেতন প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) পত্রিকায় চলিত ভাষাকে তীক্ষ্ণতম করে তুলতে চেয়েছিলেন - তাই সবুজ পত্রের মুখপত্রে তাঁর মন্তব্য শুনি - "আমাদের গৌড় ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে চেষ্টা করতে হবে।" ৪

'গৌড় ভাষার মৃৎকুম্ভ' বলতে তিনি যে চলিত ভাষাকেই উদ্দেশ্য করেছেন এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরবর্তীকালে এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষার আদর্শ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় - প্রমথ চৌধুরী যদিও ঘোষণা করেছিলেন চলিত গদ্যই তাঁর লেখার অবলম্বন হবে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত রচনায় তার প্রমাণ মেলেনি। সে ভাষা বহিরঙ্গে চলিত হলেও অন্তরঙ্গে সাধুভাষার ধীর, স্থির মননশীলতার স্বভাবকে বহন করে চলেছে। প্রমথ চৌধুরীর 'কথার কথা' প্রবন্ধ থেকে পূর্ব পৃষ্ঠার উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যের গঠনে তার প্রমাণ আছে। বাংলাভাষার ইতিহাসে এই ঘটনা এক নতুন পথের সূচনা করেছে - এই কথা আগেই বলেছি। আন্দোলনের বিষয়টি ছাড়াও আরও একটি বিষয় এই পরিক্রমায় লক্ষ্য করার মত - বিদ্যাসাগর তাঁর স্বনামে প্রকাশিত রচনায় পণ্ডিতমহলের ভাষাভিত্তিটি অবলম্বন করলেও লোককণ্ঠের অমার্জিত রূপের ব্যবহার করছেন ছদ্মনামে লেখা রচনায়। তাই লোকমুখের সান্নিধ্যবর্তী করে ভাষারূপ রচনার আগ্রহ বিদ্যাসাগরের কাল থেকেই সূচিত হয়েছে - এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। বিষয়ের প্রয়োজনে এ ভাষানির্মিত হলেও চলিত গদ্য রচনার এ ও অস্ফুট পদক্ষেপ। আসলে ইতিহাসের পদক্ষেপ এ ভাবেই অঙ্কুর থেকে মহীরুহের দিকে - এগিয়ে চলে।

আবার দেখি কবি মধুসূদন বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যে ও সম্ভাবনায় মুগ্ধ ছিলেন প্রথমাবধি। প্রহসনে তিনি শিক্ষিত বাঙালীর সাধারণ ব্যবহারের ভাষাকাঠামোটি গ্রহণ করলেন অনায়াসে শিল্পের অনুরোধে। চলিত ভাষা সৃষ্টির এ - ও এক পদক্ষেপ রূপে গণ্য হতে পারে - পরবর্তী কালে মধুসূদন এ দিক নিয়ে ভাবেন নি, অথবা ভাবলেও তার কোন সাক্ষ্য ইতিহাসে নেই। এই প্রতিটি উদ্যোগই কিন্তু গদ্যভাষার একেকটা কথ্য রূপ ভিত্তি করে লিখ্য চলিত ভাষা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নির্দেশ করেছে। উনিশ শতকের ভাষা - আন্দোলন এই বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাষারচনার আগ্রহটির একটি সুনির্দিষ্ট পথ রচনা করেছে। কখনও একক প্রচেষ্টার তাৎপর্যে, কখনও সচেতন ভাবে ভাষা রচনার উদ্যোগে, উদ্যমে, আন্দোলনে ঐ সমগ্র শতক জুড়ে চলিত ভাষা সৃষ্টির সম্ভাবনা এভাবেই ক্রমন্মোচিত হয়েছে।

মূলতঃ ভাষাকে সকল স্তরের পাঠকের বোধগম্যতা দান - বহুবিষয়চারী- বহুমাত্রিক ও তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টিকারী রূপে গড়ে তোলার আগ্রহ থেকেই চলিত গদ্যভাষাকে লিখ্য ভাষার মাধ্যম রূপে গ্রহণের উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল। আসলে মানুষ তার যে কোন প্রচেষ্টাতে যখন সফলতা লাভ করে তখনই আরও সূক্ষ্ম, আরও উন্নততর পথে এগিয়ে চলার আকাঙ্খা তাকে ঠেলে নিয়ে চলে। মানুষের সমাজগত ইতিহাসেও তার প্রমাণ আছে। ভাষার রচনার 'নিরন্তর-ক্রিয়া'র ক্ষেত্রে এ কথা আরও তীব্রতর হয়ে অনুভূত হয়। বাংলা লিখ্য গদ্যের ইতিহাসে - সাধুভাষার সমর্থ রূপ সৃষ্টি হতেই আটপৌরে রূপটিকে রচনার সদরমহলে নিয়ে আসার আগ্রহ জেগেছে। কারণ একাধিক হতে পারে।

বিদ্যাসাগরের অনুসরণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে ভাষা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন তা অনেক সময়ই তৎসম শব্দে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল - স্বভাবত বেশীর ভাগ মানুষের কাছে তা অনায়ত্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা তো ছিলই। অন্যদিকে, ইংরিজী-শিক্ষিত বাঙালী মাতৃভাষার সম্ভাবনার দিকটি লক্ষ্য করে তাকে রূপ দিতে উদ্যোগী হলেন। কখনো সচেতন (প্যারীচাঁদের ভাষা ব্যবহার) কখনও অসচেতনভাবে (কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষা ব্যবহার) সে প্রচেষ্টার নানা রূপ প্রকাশিত হল। উনিশ শতকে প্রচলিত কথ্যভাষার নানা শ্রেণীগত রূপটিকে ভিত্তি করে বিচিত্র রকম সাহিত্য সৃষ্টি হল - সেখানে প্রকাশিত ভাষার রূপ বৈশিষ্ট্যটি আমরা পর্যালোচনা করেছি। শেষ পর্যন্ত কলকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত জনমানসের ভাষার যে বিশিষ্ট রূপ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন অভিজ্ঞতার মধ্যে - তাকে ভিত্তি

করে তিনি গড়ে তুললেন চলিত গদ্যভাষার উজ্জ্বল, সাবলীল ভাষা ভঙ্গিমাটি। সে ভাষা যেমন তাঁর নিজস্ব, আবার উত্তরকালের কাছে আদর্শও। কারণ এভাষা মুখের ভাষার লিখিত রূপ ছিল না। ছিল মুখের ভাষার এক মার্জিত পরিপাটি, নমনীয় ও মর্যাদা পূর্ণ রূপ। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে এভাষা যখন মার্জিত তাকে সাধুভাষা বলব না কেন ? কেননা চলিতভাষার যে আবেদনগত প্রত্যক্ষতার কথা বারে বারেই বলেছি লেখার প্রয়োজনে এ ভাষা মার্জিত হলেও তা প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল। সাধুভাষার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠে এ ভাষা পরিণততর হয়ে উঠেছে। গ্রহনীয় হয়েছে বৃহত্তর পাঠকের কাছে সংবেদনীয় হয়ে। এই প্রসঙ্গে আরও মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চলিত গদ্য কেন শেষ পর্যন্ত 'বহুলাংশে' আদর্শ চলিত রূপে পরবর্তীকালে গণ্য হল; - ভেবে দেখলে বোঝা যায় - আমরা আগেই বলে এসেছি - ভাষা গড়ে ওঠে সংস্কৃতিজাত পরিবেশ থেকে। রবীন্দ্রনাথ যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে ভাষার আদলটি পেয়েছিলেন তা ঠাকুরবাড়ীর নিজস্ব পরিধিতে ব্যবহৃত হলেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনা কিন্তু বাহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছে ঠাকুকবাড়ীতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির দ্বারা। তাই এমন অনুমান হয়তো অযথার্থ নয় যে রবীন্দ্রনাথ কেবল সমর্থ চলিত ভাষারূপ দিলেন বলেই তা সর্বত্রগামী হল। এই ভাষাকাঠামোটি আদর্শরূপে মনে মনে বাঙালী গ্রহণ করেছে তার সাংস্কৃতিক চেতনায় এর গ্রহণযোগ্যতাকে উপলব্ধি করে। এর পরে তাই আদর্শ চলিতরীতির অনুসন্ধান আর কোনও স্রষ্টাকে করতে হয় নি।

পরিশেষে স্মরণ করতে, হয় ভাষা যতই এবার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে মানুষের 'মনে মনে মিল চাওয়া ও মিল পাওয়ার' পথটিও তাই ততই বিস্তৃততর হয়েছে। কারণ এখন থেকে ব্যক্তি মানুষ ভাষার প্রকাশ মাত্রাকে নিজ স্বভাবের অন্তর্লীন করে ব্যবহার করতে পেরেছে - বহুবিষয়চারীই শুধু নয় এবারে ভাষা হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বের অনুসারী।

আটপৌরে ভাষার মার্জিতরূপের প্রকাশ ক্ষমতা এবারে অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনা দান করেছে - সৌন্দর্যের প্রকাশে তার সামর্থ্য পরবর্ত্তী কালের পাঠকবর্গকে বিস্মিত করেছে। ভাষা সৃষ্টির ইতিহাসকেন্দ্রিক ক্রমপরিচয় উদঘাটনের পথে ইতিহাসের রূপরেখার পরিচয় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত আকাঙ্খার এই অনাবৃত প্রকাশ-পরিচয় তাই অনুসন্ধানের অন্যতর বিস্ময়কে পরিস্ফুট করে।

তৃতীয় পর্যায় গ্রন্থ নির্দেশ

১। নগেন্দ্রনাথ সোম - মধুস্মৃতি পৃষ্ঠা - ৮৩

২। প্রমথ চৌধুরী - কথার কথা - প্রবন্ধ সংগ্রহ - পৃষ্ঠা - ২৫৮

৩। তদেব - পৃষ্ঠা -২৫৯

৪। তদেব 'সবুজ পত্রের মুখপত্র' পৃষ্ঠা - ৪৬

।। গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পঞ্জী ।।

পাঠ্যপুস্তক

১। উইলিয়ম কেরী - কথোপকথন সম্পাদনা - সজনী কান্ত দাস সম্পাদিত।

২।মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার - প্রবোধ চন্দ্রিকা ।

৩।রামমোহন রায় - বেদান্ত গ্রন্থ

৪।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর - অতিঅল্প হইল - বিদ্যাসাগর রচনাবলী।

৫।প্যারীচাঁদ মিত্র - আলালের ঘরের দুলাল - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনী কান্ত দাস সম্পাদিত।

৬।কালীপ্রসন্ন সিংহ - 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

৭। মধুসূদন দত্ত - একেই কি বলে সভ্যতা - মধুসূদন রচনাবলী (ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত) তুলিকলম প্রকাশিত।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - বাংলা ভাষা- রবীন্দ্র রচনাবলী - বিশ্বভারতী(সুলভ সংস্করণ)-১৩ চৈত্র ১৩৯৮।

৯।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - যুরোপ প্রবাসীর পত্র - রবীন্দ্র রচনাবলী বিশ্বভারতী (সুলভ সংস্করণ)- চৈত্র -১৩৯৮।

১০।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - যুরোপ যাত্রীর ডায়েরী - রবীন্দ্র রচনাবলী(সুলভ সংস্করণ) বিশ্বভারতী-চৈত্র -১৩৯৮।

১১। প্যারীচাঁদ রচনাবলী - অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত - নভেম্বর -১৯৭১ মণ্ডল বুক হাউস।

১২। বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার - প্রমথ নাথ বিশী সম্পাদিত - প্রথম প্রকাশ - ১৩৬৪ মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত

১৩।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -যোগাযোগ - বিশ্বভারতী ।

১৪।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - মানুষের ধর্ম - বিশ্বভারতী।

১৫।অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - নালক - অবনীন্দ্র রচনাবলী (২য় খন্ড) ।

১৬। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - "তৃতীয় প্রবন্ধ - শিল্পায়ন (২য় সংস্করণ)।

১৭। প্রমথ চৌধুরী - চার ইয়ারী কথা - গল্প সংগ্রহ - বিশ্বভারতী।

সহায়ক গ্রন্থ

১।শ্রীভূদেব চৌধুরি - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা(২০০০) - ২ য় পর্যায় - দে'জ পাবলিশার্স।

২। পবিত্র সরকার -গদ্যরীতি পদ্যরীতি(২০০২) - সাহিত্য লোক প্রকাশনা- পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ -২০০১।

৩।সজনীকান্ত দাস - বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস - দে'জ প্রকাশনা প্রথম প্রকাশনা -প্রথম দে'জ সংস্করণ -১৯৮৮।

৪। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় - বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস - দে'জ পাবলিসার্স - প্রথম দে'জ সংস্করণ - ২০০০।

৫।অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় - বাংলা গদ্যের শিল্পী সমাজ -শান্তি লাইব্রেরী -১৯৭২।

৬।শিশির কুমার দাশ - ভাষা জিজ্ঞসা - প্যাপিরাস প্রকাশন - দ্বিতীয় সংস্করণ-১৪০৪।

৭।শিশির কুমার দাশ - গদ্যপদ্যের দ্বন্দ্ব - দে'জ পাবলিসার্স -সংশোধিত সংস্করণ-১৪০৩।

৮।শিশির কুমার দাশ - মোদের গরব মোদের আশা - চিরায়ত প্রকাশন- প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৯।

৯।শিশির কুমার দাশ -বাংলা সাহিত্য সঙ্গী - সংসদ।

১০।বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা - ৬ উদ্বোধন প্রকাশিত - ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ - ১৪০৭।

১২।সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় - বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে - জিজ্ঞাসা প্রকাশন - প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৫ ।

১৩।শিবনাথ শাস্ত্রী - রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ - নিউএজ পাবলিশার্স - তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৭৭।

১৪।রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত - শিশির কুমার দাশ (সম্পাদিত) - বিবিধ বাংলা প্রবন্ধ - শশিভূষণ স্মারক গ্রন্থ - নিউএজ পাবলিসার্স।

১৫।সবিতা চট্টোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে ইয়োরোপীয় লেখক (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ) - ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় পাবলিকেশন - প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২ - প্রথম প্রকাশ - ১৩৬৪।

১৬।নগেন্দ্রনাথ সোম - মধুস্মৃতি - গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স - প্রথম প্রকাশ - চৈত্র

-১৩২৭ দ্বিতীয় সংস্করণ - ভাদ্র ১৩৬১।

১৭। প্রবন্ধ সংগ্রহ - প্রমথ চৌধুরী - বিশ্বভারতী প্রকাশনা - সংশোধিত পুনমুদ্রণ আগষ্ট-১৯৯০।

১৮।বুদ্ধদেব বসু - রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য (১৯৫৯) - নিউএজ পাবলিশার্স।

১৯।ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - সংবাদপত্রে সেকালের কথা(১৩৫৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২০।সুকুমার সেন - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ৩য় খণ্ড - আনন্দ পাবলিশার্স বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৯৯৮)- - আনন্দ পাবলিশার্স।

২১।ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাময়িক পত্র (১৩৫৯) ১ম ও ২য় - বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ ।

২২।ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন - প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন - কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

২৩।সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় - গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ(১৯৬২) - সুপ্রকাশ প্রকাশনী।

২৪।বিপিন বিহারী গুপ্ত - পুরাতন প্রসঙ্গ বিদ্যাভারতী।

২৫।চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় - দুইশতকের বাংলা মুদ্রন ও প্রকাশন(১৯৮১) - আনন্দ পাবলিশার্স।

২৬।অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর(১৩৭৭) - মণ্ডল বুক হাউস

২৭।অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - উনিশ শতাব্দীর প্রথমাংশ ও বাংলা সাহিত্য (১৯৫৯)বুক ল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড।

২৮।অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -(সম্পাদিত)- রামগতি ন্যায়রত্ন - বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব(১৯৯১)Suprime Book Distribution।

২৯।ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - সাহিত্য সাঠক চরিতমালা।

৩০।অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন(১৯৭৮) - শৈব্যা পুস্তকালয় ।

৩১।ক্ষেত্র গুপ্ত - বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস(২০০০) - গ্রন্থ নিলয় ।

৩২।অপর্ণা চক্রবর্তী - অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ - " অবনীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্প : রূপ ও রীতি" ।

৩৩।যোগেশ চন্দ্র বাগল - মুক্তির সন্ধানে ভারত।

৩৪।সংসদ বাঙ্গালা অভিধান ।

৩৫ । Arun kumar Mukhopadhaya - Pramatha Chudhury(1961) - Sahitya Akademy.

৩৬ । Sisir Kumar Das -Early Bengali Prose -Book Land Private ltd.

৩৭ । Sisir Kumar Das - Shahibs & Munshis (2001) - Papyrus.

৩৮ । Susil Kumar De - Bengali Literature in Nineteenth Century (1962) - Farma K.L.Mukhopadhaya Publication.

৩৯ । Sukumar Sen - History of Bengali Literature (1960) - Sahitya Akademy.